পরপারের কান্ডারী

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী
মহারাজের একান্ত - ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনা সংকলন

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

শ্রুতিলেখিকা ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৪
৯ই পৌষ, ১৪১১

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ-
২৬শে জানুয়ারী, ২০০৫
৬ই মাঘ, ১৪১১

মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ১ হইতে মুদ্রিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

গুরু কৃপাহি কেবলম্। গুরু বিনা গতি নেই। কিন্তু প্রকৃত গুরু কে হতে পারেন? প্রকৃত গতিদাতা কে হতে পারেন? প্রতিটি সন্তানের কাছে পিতামাতাই শ্রেষ্ঠ গুরু। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে সন্তানের শুভ কামনায় পিতামাতা জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। সমাজ জীবনে প্রতি পদক্ষেপে এগিয়ে চলার জন্য গুরুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পিতামাতা সন্তানের শিক্ষার জন্য যেমন ভাল স্কুল, ভাল গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করেন, তেমনি শিক্ষার সাথে সাথে খেলাধুলা, সঙ্গীতচর্চা, নৃত্যচর্চা, সমাজসেবা, ধর্মনীতি, রাজনীতি, এককথায় সমাজের বিভিন্ন দিকে সন্তানকে পারদর্শী করার জন্য উপযুক্ত গুরুর ব্যবস্থা করেন। আবার শিক্ষা শেষে সমাজ জীবনের দায়-দায়িত্ব পালন করার জন্য উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর ব্যবস্থাও করেন। এইভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সন্তানের শুভকামনায় পিতামাতা নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। এতকিছু করা সত্ত্বেও পিতামাতা কি সন্তানের প্রকৃত গতিদাতা হতে পারেন?

সমাজ জীবনে একজন পাঠশালার গুরু তাঁর শিষ্যকে কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারেন? পাঠশালার গন্ডী পর্যন্ত? একইভাবে স্কুলের গুরু, কলেজের গুরু, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু (শিক্ষক) তাঁদের শিষ্যদের অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাবার ক্ষমতা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আবার খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদি জগতের গুরুদেরও নিয়ে যাবার ক্ষমতা খেলাধুলার শীর্ষস্থান পর্যন্ত অথবা সঙ্গীত জগতের শীর্ষস্থান পর্যন্ত। একজন রাজনৈতিক গুরুর তাঁর শিষ্যকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত। অর্থাৎ এইসব গুরুদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নিজ নিজ গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একথা স্বীকার করতেই হবে।

কোন অবস্থাতেই গুরু কখনও ত্যাগ হয় না। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে কেউ যদি হাইস্কুলে যায়, পাঠশালার গুরু ত্যাগ হল না। ছাত্র যত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন, পাঠশালার মাষ্টারমশাইকে ভূমিষ্ঠ হয়েই প্রণাম করে। তাই স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি কোন অবস্থাতে কোন গুরুকেই ত্যাগ করা হয় না। প্রকৃত গুরু সবসময় সন্তানস্নেহে শিষ্যের শুভকামনাই করেন। শিষ্যদের বিরাটের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গুরুর কাজ। তিনি যদি তাঁর চেয়ে ক্ষমতাবান গুরুর সন্ধান পান, তাঁর কাছেই তিনি উপযুক্ত শিষ্যদের পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

আধ্যাত্মিক জগতে যাঁরা এই ধরাধামে এসে সাধনভজন ক'রে, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে মহান হয়েছেন, তাদের টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কতটুকু? আর যিনি পূর্ণ হয়েই আসেন, এই ধরাধামে এসে নতুন করে সাধন ভজন তাঁকে কিছু করতে হয় না, অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি মহান হয়ে আসেন, এই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে যিনি মিশিয়ে দিতে পারেন, জীবের পরবর্ত্তী ব্যবস্থার গুরুভার যিনি বহন করতে পারেন, যিনি গতিদাতা অর্থাৎ **'পরপারের কান্ডারী'** হয়ে জন্মের সাথে সাথে গতির পথ দেখাতে শুরু করেন, তাঁর টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতাই বা কতটুকু?

ঠেলাগাড়ী, গরু ও মোষের গাড়ী, এক্কাগাড়ীও গাড়ী আবার মোটর গাড়ী, ট্রেন, প্লেন, জাহাজ, স্পুটনিক, এরাও গাড়ী। সব গাড়ীই নিজেরাও চলে, আবার লোকও বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু লোক বহন করার ক্ষমতা বা টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা সবার কি সমান? ঠেলাগাড়ী, গরু মোষের গাড়ী বা এক্কাগাড়ীর টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কয়েকজনকে, গ্রামগঞ্জ বা শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে। মোটর গাড়ী, ট্রেণ, এদের ক্ষমতা কয়েক শত জনকে, দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে। জাহাজ, প্লেন, এদের টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা দেশ থেকে দেশান্তরে। আবার স্পুটনিক,

রকেট এদের টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। অর্থাৎ সব গাড়ী, গাড়ী হয়েও বহন করা বা টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা সবার সমান নয়।

আজ আধ্যাত্মিক জগতে চারিদিকে গুরুর ছড়াছড়ি। সব গুরুদের কি দীক্ষা দেওয়ার অধিকার আছে? পরপারের কান্ডারী হয়ে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে? এইসব বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানকল্পে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর **শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখ নিঃসৃত বেদতত্ত্ব একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী করা হয়েছে**। এই বেদতত্ত্ব পান্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী অবস্থা থেকে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত যা চলার পথে মানুষের জীবনে গুরু সম্বন্ধে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেবে) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রচারের গুরু দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন বিভাগও গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন ''**অভিনব দর্শন**।''

''অভিনব দর্শন'' প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি তাঁর 'বাহন'টি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে দ্বিতীয় শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল -- **পরপারের কান্ডারী**।

পরিশেষে এই বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **'রাম নারায়ণ রাম'**।

এই সকল গুরু ভাইবোন ও ভক্তদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেই নয়। বিশেষ করে বর্ধমানের স্বর্গীয় চন্দন মিত্র, যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন পুরনো বই, কয়েকশত শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরোয়া ও বিভিন্ন মীটিং-এর ক্যাসেট, শ্রীশ্রীঠাকুরের শিশু বয়সের ছবি, পান্ডুলিপি ইত্যাদি দিয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন; তার মৃত্যুর পর তার মা শ্রীশ্রীঠাকুরের বই ছাপানোর জন্য স্বর্গীয় চন্দন মিত্রের কর্মজীবনের জমানো প্রাপ্ত অর্থ আমাদের প্রকাশন বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এছাড়া, কলকাতার এক কলেজের ছাত্র শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার (গুরুভাই) তার দৈনন্দিন হাতখরচের অর্থ থেকে একটু একটু করে সঞ্চয় করে শ্রীশ্রীঠাকুরের বই ছাপানোর জন্য প্রকাশন বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছে। তাছাড়া শ্রীমতি নীহার দাস, শ্রীমতি ঝর্ণা চন্দ আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন এদের সকলকে জানাই আন্তরিক বৈদিক সম্ভাষণ **'রাম নারায়ণ রাম**।'

চপল মিত্র

২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৪ ***প্রকাশক***

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'মৃত্যুর পর' বইটির মত **'পরপারের কান্ডারী'** বইটিও প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে চারিদিকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী এবং একান্ত ঘরোয়া তত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত বই নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে সকল ভাইবোন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমন্ডলীর অনুরোধে আমরা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার কথা চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছে। সবাই যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন ও তত্ত্বের মধু পান করার জন্য অধীর হয়ে পড়েছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত।

বইখানির প্রথম সংস্করণ যেভাবে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্ত্তী সংস্করণ এবং অন্যান্য বইগুলিও যাতে সেইভাবেই ছাপানো হয়, সেই অনুরোধও অনেকে করেছেন। আমরা সেইভাবেই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্বপিপাসু সকল ভাইবোন ও অনুগত ভক্তবৃন্দকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

চপল মিত্র

২৬শে জানুয়ারী, ২০০৫ *প্রকাশক*

-ঃ পরপারের কান্ডারী ঃ-

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুনরুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শ্রীশ্রীঠাকুর তত্ত্বের গভীরতা মনে গেঁথে দেবার জন্য পুনরুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

মা অসীম ধৈর্য সহকারে তাঁর সন্তানকে কোন কিছু শেখানোর জন্য বারবার করে সেই কথাটি সন্তানের কাছে বলতে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি তার মনে গেঁথে যায়, মায়ের চেষ্টার অন্ত থাকে না। সন্তান শিখে নিলে মায়ের মুখে দেখা যায় পরিতৃপ্তির হাসি।

পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের কাছে। প্রকৃতির গভীর তত্ত্বের খনি থেকে মণি আহরণ করে একটি একটি করে তুলে ধরছেন আমাদের সামনে। অনাদি-অনন্ত প্রকৃতির মায়ের কাছে আমরা সবাই নিতান্তই অবোধ শিশু। প্রকৃতির এই তত্ত্বের ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী। আমাদের মনে তত্ত্বের সুর, তত্ত্বের গভীরতা, এই অনন্ত জ্ঞানরাশি একটু একটু করে গেঁথে দেবার জন্য পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর একই সুরের কথা বারবার করে বলেছেন। একই বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি করেছেন।

পরম পিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রুতিলিখনে, টেপ-রেকর্ড ও পান্ডুলিপি থেকে সংকলনে, তিনি যখন যেমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, হুবহু সেটাই রেখে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও কখনও তিনি একই বাক্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠিক সেইভাবেই তাঁর বাণী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোল।

পরপারের কান্ডারী

পরপারের কান্ডারী

গুরু কৃপাহি কেবলম্

(০২-০৯-১৯৮৫)

মহাশূন্য হতেই গতির ধারায় নব নব সৃষ্টি হয়ে চলেছে। প্রতিটি বস্তুর কার্যকলাপ সেই গতিপথেরই এক একটি পদক্ষেপ। এর শেষ কোথায়? কোথায় এর গন্তব্যস্থল? শেষ নিঃশ্বাস ফেলে সবাইতো চলে যাচ্ছে, কিন্তু শেষ উত্তরটাতো মিলছে না। এই যে মৃত্যু পর্যন্ত সবাই প্রকৃতির আলো, জল, বাতাস থেকে অতিথির মত সেবা পেয়ে যাচ্ছে, এর জন্যই কি এই বিরাট সৃষ্টি? সৃষ্টির গতিতে স্রষ্টার আর কোন উদ্দেশ্য নেই, এটা মন মানতে চায় না। এতে সৃষ্টির ধারাকে একটা সীমার মাঝে সীমিত করা হয়। কিন্তু সূর্য-চন্দ্র গ্রহ-উপগ্রহগুলো তো কোন সীমার মাঝে নেই।

সময় কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে না। তুমি বুঝতে পারছো না বলে, সময় তোমার জন্য সময় দিয়ে বসে থাকবে, তাতো হয় না।

এই স্বল্পায়ু জীবন। এই জীবনটুকুনুর মধ্যে, সীমাটুকুনুর মধ্যে যা কিছু করে নেওয়ার নিতে হবে। যা কিছু বুঝে নেওয়ার বুঝতে হবে, বুঝেছ? কবে বুঝবে বল? বুঝতে বুঝতে তো বুঝেই চলছো, বুঝ তো আর আসছে না। কাজ তো আর হচ্ছে না। শুধু আলোচনা, সমালোচনা, তর্কে বিতর্কেই কথাগুলো ভাসছে। সময় কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে না। তুমি বুঝতে পারছো না বলে সময় তোমার জন্য সময় দিয়ে বসে থাকবে, তাতো হয় না। তার সময়ের কাঁটা ঠিক ঘুরে যাচ্ছে। জন্ম থেকে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত অবধি সেই কাঁটায় ডাক দিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছ? সময় কিন্তু তোমার সাথে কোনরকম কোন Compromise (কম্প্রোমাইজ) করছে না। সে একজন বিরাট কর্মী। তার কর্মের চাকা, তার কর্মের রথ সে চালিয়ে

যাচ্ছে। কোন কিছুতেই ভাঙছে না। আবহমানকাল থেকেই সে চালিয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। আর আমরা? সেই কালের গ্রাসে পড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি।

প্রকৃতির নিয়মেই চলছে আবহমানকাল থেকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের আবর্তনে বিবর্তনে অনন্ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা। প্রকৃতির নিয়মেই জন্ম-মৃত্যু চক্রের আবর্তনে আবর্তিত হতে হতে আমরা চলেছি। আপন ধারায় ধারাবাহিকভাবে চলছে যে প্রকৃতির নিয়মাবলী, তার থেকেই অর্থ উদ্ধার করে নিয়ে যার যার গতিপথ চালিয়ে নিতে হবে। এছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

শূন্যবাদ শূন্যে ভাসছে। অস্তি আর নাস্তির মাঝে আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদের ঠোকাঠুকি চলছে। সমাধান কোথায়?

সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে কত দর্শন, কত শাস্ত্র, কত কল্পনা, কত কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোনটার উপরেই সঠিক নির্ভর করা যাচ্ছে না। কারণ সঠিক কোন নির্দশন পাওয়া যাচ্ছে না। সমাধানও তাই হয়ে উঠছে না। হাজার হাজার বছর আগে বিচক্ষণরা যেসব শাস্ত্র গ্রন্থ তৈরী করে গেছেন, তাতে শূন্যবাদের কথাও আছে, আবার আস্তিক্য ও নাস্তিক্যবাদের কথাও আছে। কিন্তু সবই ভাষায় ভেসে আছে। শূন্যবাদ শূন্যে ভাসছে। অস্তি আর নাস্তির মাঝে আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদের ঠোকাঠুকি চলছে। কিন্তু সমাধান কোথায়?

শাস্ত্রকারেরা বেশীরভাগই যার যার ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী অধ্যাত্মবাদ করেছে। আধ্যাত্মিকতা ইউনিভার্সের নিজস্ব সুর, আধ্যাত্মিকতা ইউনিভার্সের নিজস্ব শাশ্বত সুর। অধ্যাত্মবাদ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কোনও মহান বলতে পারে না, আমি নূতন পথ দান করলাম। যে মত, পথ আছে, তাই জগতের কাছে দান করে। আমি আবিষ্কার করলাম, মানে নূতন কিছু নয়, প্রকৃতির মধ্যে যেটা আছে, সেটাই পৌঁছে দেওয়া হল। স্রষ্টা স্বয়ং সব এমনভাবে রেখেছেন,

আধ্যাত্মিকতা ইউনিভার্সের নিজস্ব শাশ্বত সুর। অধ্যাত্মবাদ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কোন মহান বলতে পারে না, আমি নূতন পথ দান করলাম। প্রকৃতির মধ্যে যেটা আছে, সেটাই পৌঁছে দেওয়া হল।

এমনভাবে আমাদের জড়িয়ে রেখেছেন যে খুঁজতে গেলেই পাওয়া যায়। রহস্য, কপাল বা ভাগ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নির্ভরশীল নয়। আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে সত্য বস্তুকে খুঁজে পাওয়া। যেটা আছে, সেটা দিয়েই জগৎকে চিনে নিতে হয় এবং খুঁজতে গিয়ে ভাগ্যফলের উপর নির্ভর করতে হয় না। অতি সহজ বস্তু, যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের উপরই এই সহজ কাজ ন্যস্ত হয়েছে।

মুনি-ঋষিদের ভাষ্য, উবাচ গ্রন্থের মধ্যে যেসব লেখা রয়েছে, অধিকাংশই কল্পনা আর গল্পের মাধ্যমে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ কল্পনায় থাকে না। সেটা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার মত; গাছ, ফুল, ফল, বীজের মত। পাহাড়, পর্বত, গ্রহ নক্ষত্রও সেইভাবে সাজানো। আমার উদ্দেশ্য বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর থেকে কাটা ছেঁড়া করে সব বুঝিয়ে দেওয়া। তোমরা প্রত্যেকে জানতে পারবে, সিদ্ধি মুক্তি কি? যা বোধে নেই, তা বোধগম্য হয়েছে, সেটাই তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব বেশী জাগতিক। উবাচ, ভাষ্য টীকাতে কৌশলবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। তৈরী করতে গেলেই মনগড়া কথা হয়ে যায়। এতেই শাস্ত্র বিকৃত হয়ে গেছে।

সৃষ্টির নিয়মে যে নিয়মগুলো আছে, সেই নিয়মগুলো আমাদের জীবনের চলার পথের পাথেয়। সৃষ্টির নিয়মে যত বিধি-ব্যবস্থা সব কিছুই চলার পথে মহান্ সাথী হিসাবে আমাদের প্রয়োজন। অজ্ঞান জীব প্রতিমুহূর্ত্তে ভুল করে। কেন এত সাজা? কেন এত দুঃখ? আগেই বলেছি, রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা জীবনের মহান উদ্দেশ্য সাধনের ও গড়ার পথের সাহায্যকারী। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সমূহ ব্যথা বেদনায়। অনেকবার বলেছি, আঘাত আসবে, দুঃখ আসবে, প্রস্তুত থাকতে হবে। কেন সে গেল? কেন বিধাতা তাকে শাস্তি দিল না? আমরা সারাজীবন ছোটবেলা থেকে যা যা করে চলেছি, সেগুলো চুলচেরা বিচার করলে দেখবে, আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে আঘাত আসা উচিত ছিল। কারণ আমরা দুঃখ আঘাত থেকে রক্ষা

কেন এত সাজা? কেন এত দুঃখ? আমরা সারাজীবন ছোটবেলা থেকে যা যা করে চলেছি, সেগুলো চুলচেরা বিচার করলে দেখবে, আমাদের প্রতিমূহূর্ত্তে আঘাত আসা উচিত ছিল।

পাওয়ার জন্য কোন কাজ করি না। সবসময় আঘাত দিয়ে খুন করেই চলেছি।

জীবজগতে সকলেরই সম-অধিকার এই পৃথিবীর বুকে। যারা জলে, বাতাসে, মাটিতে বিচরণ করে; জল, মাটি, বাতাস যারা সমভাবে গ্রহণ করে, তারাই হল আমাদের সমতুল্য, সমজাতি। তাই শুধু মানুষ জাতি নয়, মাছি, মশা, পিঁপড়ে সবাইকে জীব বলে আখ্যা দিয়েছে। মশা, মাছি সবাই সম-অধিকার নিয়ে বাস করছি। তাদেরও প্রত্যেকের ছেলে পেলে আছে, ঘর আছে। তাদের আঘাত দিয়ে, তাদের খুন করে আমরা চলেছি। সৃষ্টির নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা সব সময় করে যাচ্ছি। আমরা কি করছি, তোমরা কি করছো, তা আগে চিন্তা করবে। তুমি কতটা মাছ মেরেছ, কত পিঁপড়ে মেরেছ, মশা মেরেছ, তার ফল বুঝতে পারছ না। প্রত্যেকটি দীর্ঘশ্বাসে তাদের ব্যথা বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা না খেতে পেয়ে মরে গেছে। অযথা কাউকে মারার অধিকার কারও নেই। ওটাই যদি আমাদের জীবনধারণের প্রধান খাদ্য হ'ত, তবে আলাদা কথা। দেখবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওটা না খেয়ে, না মেরে চলা যায়। প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্টির বিচার হয়ে যাচ্ছে। কোন্ আঘাতের ফলে কিভাবে যে ধাক্কা খেতে হবে, বলা মুস্কিল।

প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্টির বিচার হয়ে যাচ্ছে। কোন্ আঘাতের ফলে কিভাবে যে ধাক্কা খেতে হবে, বলা মুস্কিল।

তাই প্রতিমুহূর্ত্তে চিন্তা করে কাজ করবে। তুমি আমার কাছে গোপন করে, অপরের কাছে গোপন করে কাজ করে যেতে পার, কিন্তু মুক্ত আকাশের কাছে ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই খুব সাবধানতার ভিতর দিয়ে জীবন কাটাবে। তবে সব কিছু মুছে যায় একমাত্র নামে। কিন্তু তুমি যদি মনে কর, আমি আকাম করবো, অন্যায় করবো, আর নাম করবো, তাতে হবে না। যে অন্যায় কাজগুলো

তুমি যদি মনে কর, আমি আকাম করবো, অন্যায় করবো আর নাম করবো, তাতে হবে না। যে অন্যায় কাজগুলো তোমার অজ্ঞাতে হয়েছে, সেগুলো নষ্ট হয়। যেগুলো সজ্ঞানে করছো, তা নষ্ট হয় না।

তোমার অজ্ঞাতে হয়েছে, সেগুলো নষ্ট হয়। যেগুলো সজ্ঞানে করছো, তা নষ্ট হয় না।

দৈব তাকেই রক্ষা করে, যে দৈবের সাথে মিশে আছে। পূর্বজন্মের ক্লেদ নিয়ে যারা আসে, তাদের আবার জন্ম হয়। হাজার হাজার জন্ম হবে। দৈব দেখে, এই জন্মই যাতে শেষ জন্ম হয়। সমস্ত জীবনের দুঃখ, ব্যথা একজীবনের মধ্যে কাটিয়ে যাতে নিয়ে যাওয়া যায় সেই চেষ্টাই করে। তোমরা মুক্ত পথের পথিক। দৈবকে তোমরা আশ্রয় করেছ, স্রষ্টার সৃষ্টির উপর নির্ভর করেছ। কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। তাই গুরু যিনি, তিনি সবকিছুর ভার নিয়ে সেই চির আনন্দলোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। তাই গুরু যিনি, তিনি সবকিছুর ভার নিয়ে সেই চির আনন্দলোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কে নিয়ে যেতে পারেন? প্রকৃত গুরু কে? প্রকৃত সাধক, মহান্, অবতার কি করে চেনা যায়? কে প্রকৃত গতিদাতা? -- এ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় অনেক কথা।

ছোটবেলায় দেখেছি, লেনদেনের ব্যাপারে রূপার টাকা আসল না অচল, মেকি না সাচ্চা, তা টোকা দিয়ে সবাই জেনে নিত। সাধারণ লোকেই কিন্তু এটা করতো। তারা ধনবানও নয়, অর্থবানও নয়, কিন্তু ক্ষমতাবান। বাজিয়ে দেখবার ক্ষমতাটা তাদের ঠিক ছিল। যেটা মেকি, যেটা নকল সেটা তাদের হাতেই ধরা পড়ে যেত।

সাধক, মহান্, অবতারদের বিষয়ে জানতে চাইলে সেখানেও আসল, নকল, বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঠিকমত বাজিয়ে দেখলেই বুঝা যায়। তোমার বাজিয়ে দেখবার দৃষ্টি যদি ঠিক থাকে, দর্পণের মত চোখ, কান বুঝ যদি স্বচ্ছ থাকে, তবে আসল আর নকলের ঠিক ঠিক প্রতিচ্ছবি সেখানে

মধু মিষ্টি যার জিহ্বায় দেবে, সেই তার স্বাদ বুঝবে। যখনই সেখানে দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ আসবে, তখনই বুঝতে হবে সে মধুতে ভেজাল। আসল বস্তু সম্বন্ধে কারও মনে দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকে না।

পড়বেই। মধু মিষ্টি, যার জিহ্বায় দেবে, সেই তার স্বাদ বুঝবে। মধুর মিষ্টতা সদ্যোজাত শিশুও বুঝবে। আবার মৃতপ্রায় বৃদ্ধও বুঝবে। যখনই সেখানে দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ আসবে, তখনই বুঝতে হবে সে মধুতে ভেজাল। আসল বস্তু সম্বন্ধে কারও মনে দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকে না।

সাধক, মহান্, অবতার বলতে এখানকার বেশীরভাগ লোকেরা ভাবেন, তাঁদের সঙ্গে ঊর্ধ্বলোকের যোগাযোগ আছে। এঁদের দেবদর্শন, সিদ্ধি, মুক্তি হয়ে গেছে। বাস্তবের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ খুবই সমান্য। সাধারণের এই চিন্তাধারাটা ধারণার ধারাতেই বয়ে চলেছে। তাঁরা যা কিছু ভাবছেন, যা কিছু বলছেন, সবই ধারণা করেই বলছেন। ধারণা করতে করতে নিজের অজ্ঞাতে ক্রমশঃই সেখানে কল্পনা এসে বাসা বাঁধে। এই ধারণা আর কল্পনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কঠিন। আজকের দিনে এ দুটিই অনেক কিছু অনাসৃষ্টি ও অশান্তির মূল, অনেক অনিষ্টেরও মূল। ধারণা আর কল্পনা মিলেই যতসব অলীক চিন্তার সৃষ্টি হচ্ছে। তারই সুযোগ নিচ্ছে একশ্রেণীর ব্যক্তিরা। এরা ভালভাবেই জানে, সাধারণ ব্যক্তি অজ্ঞ। অনেক বিষয় তারা জানে না, বোঝে না। অথচ ধারণার বশে অজানা বিষয়ের উপর অনেক কিছু সহজেই আরোপ করে বসে। এদের এই অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর ব্যক্তিরা লোকের মুখে মুখে সাধক, মহান্, অবতার আখ্যা পেয়ে সমাজের বুকে শিকড় গেড়ে বসছে। এটা গভীর চিন্তার বিষয়। তোমরা বুঝতে পারছো আমার কথা?

ধারণা আর কল্পনা মিলেই যতসব অলীক চিন্তার সৃষ্টির হচ্ছে। তারই সুযোগ নিচ্ছে একশ্রেণীর ব্যক্তিরা।

এখানে বেশীরভাগ মানুষ মনে করে শাস্ত্রের বুলি যে যত বলতে পারবে, ভগবানের দুয়ারের দিকে সে তত বেশী এগিয়ে আছে। তাই শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা যে যত বেশী ধারালভাবে সমাজের বুকে দিতে পেরেছে, সাধারণের কাছে সে তত তাড়াতাড়ি সাধক, মহাপুরুষের স্থান দখল করতে পেরেছে। সাধারণের এই সাইকোলজি বুঝতে পেরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সাধক, মহান্, অবতারের গদী দখলের জন্য নানা

এখানে বেশীরভাগ মানুষ মনে করে শাস্ত্রের বুলি যে যত বলতে পারবে, ভগবানের দুয়ারের দিকে সে তত বেশী এগিয়ে আছে।

ফাঁক-ফন্দী, কলকৌশল তৈরী করতে আরম্ভ করলো। তাদের সেসব বুলি বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে, সেগুলি সাগরের জল, না খাল-বিল-খানা-খন্দের জল? অযথা কল্পনার বুলি আওড়িয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া চলে না। সাধকের সাধনার ফল সমাজের শুভ কাজে লাগে। ফাঁক-ফন্দী আর কলকৌশলের চর্চায় শয়তানীতে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। কিন্তু তাতে সমাজের ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছুই হয় না।

আগেই বলেছি, শাস্ত্রের সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ, ভগবৎদর্শন ইত্যাদির বুলি আওড়িয়ে একশ্রেণীর ব্যক্তি সাধারণকে দিয়ে নিজেদের ভগবান, অবতার ইত্যাদি বলিয়ে নিচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের কাওলাতি আছে সন্দেহ নেই। শাস্ত্রের বাছা বাছা বুলিগুলো শিখে নিয়ে এমনভাবে সেগুলির মারপ্যাঁচ খেলে চলেছে যে, সে প্যাঁচে অধিকাংশই আটকা পড়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রকে অবলম্বন করে এরা তাদের মারপ্যাঁচের খেলা খেলে গেলেও এদের শাস্ত্রজ্ঞ বলা চলে না।

শাস্ত্রের বুলি কন্ঠস্থ করা আর তার অর্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা এক কথা নয়। যাঁরা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সমাজে তা প্রয়োগ করছেন, তাঁরাই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই সাধক, মহান্। অথচ তাঁরা নিজেরা কখনও অবতার, ভগবান 'বনতে' চান না। 'বুঝে নেওয়া' এক জিনিস আর ব'নে যাওয়া আর এক জিনিস। এখানে বেশীরভাগ 'ব'নেই' যাচ্ছে। 'এখানকার সবকিছু বৃত্তান্ত আমি জানতে চাই'-- এই জানার পিপাসায় শাস্ত্রপাঠ করে, বেদ পাঠ করে তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বুঝতে বুঝতে সীমানার দিকে এগিয়ে যাওয়াই সাধনা। বিশ্লেষণের পথে এগিয়ে যেতে যেতে অর্জিত জ্ঞান সমাজগঠনের কাজে লাগিয়ে যাওয়াই সাধক ও মহানের

শাস্ত্রের বুলি কন্ঠস্থ করা আর তার অর্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা এক কথা নয়। যাঁরা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেছেন এবং সমাজে তা প্রয়োগ করছেন, তাঁরাই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ।

এখানে আমরা বেশীরভাগই কি পাচ্ছি? একদল স্বার্থান্বেষী প্রয়োজনমতো শাস্ত্রের বুলি আউড়ে সাধু, গুরু, মহান ব'নে গিয়ে জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে।

কাজ। একদিকে তিনি জ্ঞানের পিপাসায় এগিয়ে যাবেন, আর একদিকে অর্জিত জ্ঞান জীবের কল্যাণ সাধনে ব্যবহার করবেন। কিন্তু এখানে আমরা বেশীরভাগই কি পাচ্ছি? একদল স্বার্থান্বেষী প্রয়োজনমতো শাস্ত্রের বুলি আউড়ে সাধু, গুরু, মহান ব'নে গিয়ে জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে।

তোমরা তো জান, ধারণার উপর কথা বললে সেটা সত্যের পর্যায়ে পড়ে না। ধারণার উপর যে কথাগুলো হবে, সে কথার উপর নির্ভর করা চলে না। শাস্ত্রের তথাকথিত সুন্দর বোল, সুন্দর নিয়ম, আঁটোসাঁটো বিধিব্যবস্থাগুলো শুনতে খারাপ লাগে না। কিন্তু শাস্ত্রকারদের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ কেউ করে যেতে পারেননি যে, এগুলি পালন করলে অমুক ফলটি হাতে হাতে পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি কৃশ, স্বাস্থ্যরক্ষার আইনমত কাজ করলে সে একদিন পালোয়ান হবেই। এর দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ অনেক আছে। আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, বিশ্রাম সবকিছুর বিধিব্যবস্থা মেনে চললে কম হোক, বেশী হোক, কাজ হবেই। কিন্তু এখানকার বেশীরভাগ সাধক সম্প্রদায় শাস্ত্রের যে বিধিব্যবস্থাগুলো দিচ্ছেন, সেগুলি ধরে ধরে অগ্রসর হলে যে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটবেই, তার প্রমাণ পাচ্ছি কোথায়? ভগবান ব'নে যাওয়া তো দূরের কথা। তাঁদের দেওয়া Instrument (বিধিব্যবস্থা) ধরে ধরে বহু ব্যক্তি বহু পরিশ্রম করে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছে, কেউই কোন হদিশ পায়নি। একমাত্র শোনা যায়, স্বপ্নে কারুর কারুর ভাল দর্শন হয়েছে। কিন্তু সেটাতো প্রমাণ নয়। আমরা ভয়, ভীতি ও সংস্কারে এমনই অন্ধ যে, সত্য জিনিসটা বুঝেও বুঝতে পারি না। কোন কোন সাধক আবার বলে, দেবদেবীরা সর্বদাই তাঁর সঙ্গে এসে কথাবার্তা বলেন। আমরা সেটা মেনে নিই। কখনও ভয়ে মানি, কখনও সংস্কারে মানি, আবার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বাসে মানি। আত্মবিশ্লেষণ যদি কর, তবে দেখবে, এই মেনে নেওয়ার পিছনে

শাস্ত্রকারদের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ কেউ করে যেতে পারেননি যে, এগুলি পালন করলে অমুক ফলটি হাতে হাতে পাওয়া যাবে।

আমরা ভয় ভীতি ও সংস্কারে এমনই অন্ধ যে, সত্য জিনিসটা বুঝেও বুঝতে পারি না।
কয়েকজন দর্শন করলো আর বেশীরভাগই বঞ্চিত হলো, এটা যুক্তিসম্মত কথা নয়।

ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্বটা থেকেই যাচ্ছে। কয়েকজন দর্শন করলো আর বেশীরভাগই বঞ্চিত হলো, এটা যুক্তিসম্মত কথা নয়। যিনি প্রকৃত সাধু তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি সত্য কথাই বলবেন, 'এখনও অন্ধকারেই আছি। শুধু আত্মতৃপ্তিতে কাজ করে যাচ্ছি।'

আমার কাছে ভগবদ্ দর্শন সম্পর্কে কেউ জানতে এলে, আমি বুঝিয়ে বলি, যেভাবে ভগবানকে সকলে চায়, সেভাবে ভগবদ্ দর্শন হয় না। ভগবদ্ উপলব্ধি করতে হলে চোখের সামনে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পাচ্ছ, তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দাও। যে জিনিস জান না, বোঝ না, তাকে নিয়ে অযথা মাথা না ঘামিয়ে, ভগবান 'আছে' কি 'নেই' সে চিন্তা না ক'রে তোমার সমাধানের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বস্তুর বিশ্লেষণ ক'রতে ক'রতে এগিয়ে যাও। বিশ্লেষণের পথই পথ। সে পথই আমি সবাইকে দেখাচ্ছি। এ পথ ঠিক কি বেঠিক, তোমার বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়বে। তাই কি যে ঠিক আর কি যে বেঠিক, কে যে ঠিক আর কে যে বেঠিক -- এটা নির্ধারণ করা খুব একটা মুস্কিল নয়। বিশ্লেষণ করে দেখ, বাজিয়ে দেখ। আসল জিনিসের সুরই আলাদা। সে সুর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না, একেবারে ভিতরে গিয়ে সাড়া জাগায়। প্রকৃত মহানের কার্যকলাপ, গতিবিধি, চালচলন, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী সব হবে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসম্মত। ধারণা এসে সেখানে বাসা বাঁধে না। তাঁর মুখে কল্পনা বা ধারণার কথা কখনই থাকবে না। যেটুকু তিনি বুঝেছেন, সেটুকুই তিনি বলবেন। যুক্তি ছাড়িয়ে তাঁর কথা ও কাজ এতটুকু এদিক ওদিক হবে না। নাগালের বাইরের কথা বলে আর 'ভড়ং' দেখিয়ে তিনি জনগণকে কখনই বিভ্রান্ত করবেন না। এমন কথা তিনি কখনও বলবেন না, যার হদিশ কেউ কখনও পায়নি এবং পাবে না।

বিশ্লেষণ করে দেখ, বাজিয়ে দেখ। আসল জিনিসের সুরই আলাদা। সে সুর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না, একেবারে ভিতরে গিয়ে সাড়া জাগায়।

প্রকৃত সাধু, গুরু, মহান চিনতে কোন অসুবিধা নেই। তাকে ধর, ভাল করে জেরা কর। জিজ্ঞাসা কর, 'কি তুমি বুঝেছ'? সে কি উত্তর দেয়, মন দিয়ে শোন। যুক্তি দিয়ে বিচার কর। তবেই বুঝতে পারবে,

প্রকৃত সাধু, গুরু, মহান চিনতে কোন অসুবিধা নেই। তাকে ধর, ভাল করে জেরা কর। জিজ্ঞাসা কর, 'কি তুমি বুঝেছ?' সে কি উত্তর দেয়, মন দিয়ে শোন। যুক্তি দিয়ে বিচার কর।

তার ভিতরে প্রকৃত কিছু আছে, না গুরু, মহান সাজবার জন্য বলছে। তোমার ঘরের খবর তুমি যেভাবে বলবে, অন্যে সেভাবে কখনও বলতে পারবে না। তার কথার ধারাই জানিয়ে দেবে, সে কোন্ ঘরের। যাঁর প্রকৃত দেবদর্শন হয়েছে, যিনি প্রকৃত জন্মগত সিদ্ধ পুরুষ, তাঁর বলার ধরণ থাকবে সেইরকম। যাঁকে তুমি মহান বলছো, তাঁর বলার ভঙ্গীতে যদি তোমার মনের দ্বন্দ্ব না ঘোচে, তবে বুঝবে, তিনি মাঝপথে ঠেকে আছেন। দ্বন্দ্ব যদি ঘোচে, তবে বুঝবে তিনি প্রকৃত মহান। এটা হচ্ছে অঙ্কের নামতার মতো। তোমার যদি নামতা মুখস্থ নাও থাকে, তবুও অন্যের বলার ভঙ্গীতে তুমি বুঝতে পারবে, ও ঠিক বলছে না ভুল বলছে। ও মুখে মুখে বলে যাবে, তুমি কষে কষে মিলিয়ে যেতে পারবে। প্রকৃত মহানের মুখের কথাও তেমনিভাবে মিলিয়ে যেতে পারবে। তোমার নিরপেক্ষ যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাও। যন্ত্রে নকল-আসল, অচল-সচল সব ঠিক ঠিক ধরা পড়বে। বুঝের চিন্তা নিয়ে এগিয়ে গেলে টোকা দিলেই মেকি আর সাচ্চা ঠিক বুঝতে পারবে। তার কথাতেই তাকে বাজিয়ে নিতে পারবে। সাচ্চা ব্যক্তি খুবই practical. তিনি কল্পনার কথা বলবেন না। তিনি কখনই বলবেন না, অমুক তিথিতে স্নান করলে বা এত দানধ্যান করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে অথবা অমুক যোগে (গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ) এত লক্ষ জপ করলে বিশাল পুণ্য হবে। এসব যদি সবাই যুক্তি দিয়ে বুঝতেই পারতো, তবে আর উপদেশের অপেক্ষা কেউ করতো না। নিজেদের তাগিদেই তারা একাজ করে যেত।

এখানে যত সাধু মহানদের কথা শোনা যায়, তাদের বেশীরভাগই এখানে কাজ ক'রে, সাধনা করে সাধু মহান হয়েছেন। ষোল থেকে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁদের বিবেক বৈরাগ্য জেগেছে। তারপর এক একজন এক এক মত ও পথ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন এবং সাধনায় রত থেকেছেন। এঁদের অনেকেই বড় বড় সাধকের পর্যায়ে পড়েন। কিন্তু কে যে সিদ্ধ পুরুষ, সেটাই জিজ্ঞাস্য। ধর, একজন সাধকের ১৬ বছর বয়সে বৈরাগ্য এল; ২৫ বছর বয়সে তিনি যদি মহান হন, তবে তাঁর

যাঁকে তুমি মহান বলছো, তাঁর বলার ভঙ্গীতে যদি তোমার মনের দ্বন্দ্ব না ঘোচে, তবে বুঝবে তিনি মাঝপথে ঠেকে আছেন। দ্বন্দ্ব যদি ঘোচে, তবে বুঝবে তিনি প্রকৃত মহান।

সেই ১৬ বছরের চালাকি, ভেদবুদ্ধি তো থেকেই যাবে। রায়টের সময় একজন মুসলমান টিকি রেখে হরি হরি করছে। কিন্তু একজন কেমন করে তাকে চিনে ফেলল, তারপর মাথায় বাড়ি পরতেই বেরিয়ে এল 'ইয়া আল্লা'। *ঘা পড়লেই আসলটা বেরিয়ে পড়ে। সেই সাধক সাধনার যত উপর স্তরেই তিনি উঠুন, ১৬ বছর ধরে যে বৃত্তিগুলো তাঁর মধ্যে কাজ করেছে, সেই ১৬ বছরের সংস্কারটা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সেগুলি মাঝে মাঝে তার মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারবেই। তার হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাওয়া খুব কঠিন।

সিদ্ধ পুরুষ হবেন জন্মগত। সত্যের সুর নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সত্যের সন্ধানে তাঁকে সাধনা করতে হয় না। সত্যকে নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। জন্মের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে সুরের স্ফূরণ হতে থাকে। মায়ের পেট হতে পড়েই তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ হতে থাকে। শিশু বয়স থেকে ফুটে উঠতে থাকে তাঁর ভিতরের সুর। সেই সুরেই তাঁকে চেনা যায়। সুরেই তাঁর পরিচয়। এখানে এসে তিনি দেখেন, লক্ষ লক্ষ লোক, এদের সাধনা করে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই ইঞ্জিন হয়ে সেই চির আনন্দময় অনন্তধামে সবাইকে টেনে নিয়ে যান। সেই রকম ইঞ্জিনের শক্তি নিয়েই প্রকৃত মহান আসেন।

একজন সাধকের ১৬ বছর বয়সে বৈরাগ্য এল; ২৫ বছর বয়সে তিনি যদি মহান হন, তবে তাঁর সেই ১৬ বছরের চালাকি, ভেদবুদ্ধি তো থেকেই যাবে।

জন্মসিদ্ধ মহানদের থাকবে এক প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ধারা। সূর্য উদয়ের পূর্বে যেমন সারা আকাশে তার আভাস ছড়িয়ে প'ড়ে তার উদয়ের সূচনা জানিয়ে দেয়, তেমনি জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষদের আবির্ভাবের পূর্বে নানা আভাস ইঙ্গিত জাগতে

সিদ্ধ পুরুষ হবেন জন্মগত। সত্যের সুর নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সত্যের সন্ধানে তাঁকে সাধনা করতে হয় না।

* ঠিক এমনিভাবে অনেক হিন্দুও রায়টের সময় বাঁচার জন্য মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। কিন্তু চিনতে পেরে তাদের মাথায় বাড়ি মারতেই, 'হা ভগবান, হা নারায়ণ' ইত্যাদি বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

থাকে। কথাটা একটু কল্পনার মত মনে হলেও কল্পনা নয়। সূর্য যে উদিত হবে, আকাশের লাল রং আর পাখীর ডাকই সেকথা জানিয়ে দেয়। অস্তের সময়ও আকাশ লাল হয়, পাখীরাও ডাকে। ঠিকমত নিরীক্ষণ করলে সাধারণদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, কোন্‌টা উদয়ের লাল আর কোনটা অস্তের লাল; পাখীর কোন্ ডাকটা উদয়ের আর কোন্ ডাকটা অস্তের।

এই যে মহাকাশ – যাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সেই মহাকাশ এক বিরাট চৈতন্যের ভান্ডার। সেখানে এক মহাচৈতন্যের খেলা চলেছে আপনমনে, আপনগতিতে। জীবজগতের সৃষ্টির মাধ্যমেই বাস্তব জগতের বুদ্ধি, বিবেক, বিচার, বিবেচনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারিকুরী থেকেই মহাচৈতন্যের কথা ধারণায় আনা যায়। এটাতো প্রমাণিত -- একটা বস্তু থেকেই আর একটা বস্তুর সৃষ্টি। আমি যখন আছি, আমার পিতাও আছেন। পিতার পিতা এবং তাঁরও পিতা -- এইভাবে অগণিত পিতার ধারণা আমি করতে পারি। এই যে ধারাবাহিক পিতা -- এটা কল্পনার কথা নয়। এটা ধারণা করা যায়, কিন্তু বলে শেষ করা যায় না, কোথায় এর উৎস। ঠিক সেইরকম জীবজগতে যে বাস্তবচেতনা, বিবেক ইত্যাদির পরিচয় পাচ্ছি, -- একটা চৈতন্যের ভান্ডার না থাকলে তা হতে পারে না। কোথায় সে ভান্ডার? যে চেতনা বা বিবেক, যা দিয়ে আমরা ভালমন্দ ধরতে পারি, বুঝতে পারি, সেই চেতনা যে দেহ ধারণ করে আছে, সেই দেহ যখন আকাশ থেকে সৃষ্টি, তখন চেতনাও আকাশ থেকে সৃষ্টি। এর থেকেই ধরে নেওয়া যায়, আকাশ, মহাকাশ, চৈতন্যে ভরা, মহাচেতনায় ভরা।

জন্মসিদ্ধ মহানদের থাকবে এক প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ধারা। সূর্য উদয়ের পূর্বে যেমন সারা আকাশে তার আভাস ছড়িয়ে প'ড়ে তার উদয়ের সূচনা জানিয়ে দেয়, তেমনি জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষদের আবির্ভাবের পূর্বে নানা আভাস ইঙ্গিত জাগতে থাকে।

মহাকাশে অগণিত গ্রহ নক্ষত্রের সূক্ষ্ম কারিকুরী, প্রকৃতির নির্ভুল কার্যধারা, জীবের বুদ্ধি বিবেচনা, চিন্তাধারার প্রয়োগ ইত্যাদি দেখে একথাই বলা চলে, মহাকাশ মহাচেতনায় ভরা। অথচ খুঁজতে গেলে কোন বিশেষ চৈতন্যময় পুরুষ, যাঁকে ভগবান,

চেতনা বা বিবেক, যা দিয়ে আমরা ভালমন্দ ধরতে পারি, বুঝতে পারি, সেই চেতনা যে দেহ ধারণ করে আছে, সেই দেহ যখন আকাশ থেকে সৃষ্টি, তখন চেতনাও আকাশ থেকে সৃষ্টি।

ঈশ্বর বা আল্লা বলা হচ্ছে, সেকরম কারুর সন্ধান তুমি কখনও পাবে না। কিভাবে প্রকৃতির বুকে এসব কাজ হয়ে যাচ্ছে, তাও জানতে পারছো না। অথচ হয়ে যাচ্ছে, এটা দেখতে পাচ্ছ। এই চৈতন্যের ধারা সবার ভিতরই রয়েছে। তবে শিশু বয়স থেকে যাঁর ভিতর এই মহাচৈতন্য স্ফূরিত হয়ে উঠেছে, তিনিই মহান।

সৃষ্টির কার্যকলাপের মত বড় বিভূতি আর নেই। চোখের সমানে সবকিছু সাজান, সুসজ্জিত। পর পর কি হবে তারও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। সচেতনভাবে সব কাজ ঠিকমত শৃঙ্খলার সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে এই যে আশ্চর্যের ধারা চলেছে, সেই আশ্চর্য প্রকৃতিই প্রকৃত আচার্যের কাজ করছে। এই আশ্চর্য বিভূতিসম্পন্ন আচার্যের গতিবিধি অনুসরণ করে যাও। সৃষ্ট বস্তুকে রক্ষা করার জন্য তাঁর কত সুবন্দোবস্ত। এই সুবন্দোবস্ত সবদিকে সবার জন্য, সবার ভিতর রয়েছে। আপনা-আপনি হয়ে যাচ্ছে, আপনা-আপনিই মিশে যাচ্ছে। এই আপন গতির ধারা বিশ্লেষণ করলেই বেশ উপলব্ধি করতে পারবে, এর মধ্যেই একটা চেতনা কাজ করছে। সেই 'সচেতন' অনন্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তার ধারায় কোন ফাঁক নেই। আপনগতিতে শাখা-প্রশাখার মত বেরিয়ে সর্বত্র ব্যাপ্তমান হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, উপলব্ধি করছি, অথচ ধরতে গেলে, খুঁজতে গেলে কিছুই পাচ্ছি না। না পেলেও এটাতো দেখছি, এ গতি থেমে নেই। কেউ থামাতে পারছেও না। যে যা কিছু করে যাক, গতি তার কাজ ঠিকই করে চলেছে। একটা বীজ ঘরের আলমারিতে রেখে দাও, সে শুকিয়ে যাবে। তাকে নিয়ে মাটিতে পুঁতে দাও, কি সুন্দর আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই 'গতি' তার ভিতরেই ছিল। জায়গামত সে তার পরিচয় দিতে আরম্ভ করলো। বীজটা যখন ঘরে রেখে দেওয়া হলো, তখন সে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। ওটাই তার ভাষা। শুকিয়ে সে জানিয়ে দিল, 'এইভাবে আমায় রেখোনা।' বীজের বার্তা আমরা এইভাবেই জানতে পারছি। এই জানা বস্তু বীজের বিবরণ থেকেই

মহাকাশ মহাচেতনায় ভরা। অথচ খুঁজতে গেলে কোন বিশেষ চৈতন্যময় পুরুষ, যাঁকে ভগবান, ঈশ্বর বা আল্লা বলা হচ্ছে, সেরকম কারুর সন্ধান তুমি কখনও পাবে না।

অজানা বিশ্বের বার্তার ইঙ্গিত বুঝে নেওয়া যায়। জীবজগতের অস্তিত্ব, কিভাবে তার শুরু, কোথায় তার অবসান সব কিছুরই ইঙ্গিত রয়ে গেছে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুরূপী বীজের মধ্যেই। বীজ একথাই জানিয়ে দিচ্ছে, সবার ভিতরে চেতনার গতি আছে। পরিবেশ মত তাকে ফেলতে হবে, তবেই কাজ হবে।

বীজের ভিতর অঙ্কুর থেকে ফুল, ফল পর্যন্ত গাঁথা থাকে। যে গাছের বীজ, সেই বীজে সে গাছই হয়। এখানে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, সব ইউনিভার্স থেকেই। ইউনিভার্সের ক্ষমতা নিয়েই এখানে সবাই জন্মগ্রহণ করেছে। অতএব প্রত্যেকেই ইউনিভার্সের বীজ। একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। অথচ সবার ভিতর সে সুর ফুটছে না বা জাগছে না। একটা গাছে কত ফল হয়। একটা ফলে কত বীজ হয়। সব বীজের মধ্যে গাছের সম্ভাবনা কিছু কিছু থাকলেও সব বীজ গাছ হয় না। যাঁর ভিতর শিশু বয়স থেকে বিশ্বের সুরের স্ফূরণ দেখা দেবে, তিনিই হলেন প্রকৃত সুরজ্ঞ। বিশ্বের সুরের সাথে অন্যের সুর মিলিয়ে যিনি সকলকে বিশ্বের গতির ধারায় টেনে আনতে পারবেন, তিনিই হলেন প্রকৃত মহান। মহাচেতন যে স্ফূরণের মাধ্যমে কাজ করছে, জন্মের সাথে সাথে ঐ স্ফূরণ যাঁর হবে, তিনিই একমাত্র পারবেন প্রকৃত পথ দেখাতে। তিনিই পারবেন পরবর্তী কাজের নির্দেশ দিতে। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন, গতিবিধি সব থাকবে সেই সুরের স্ফূরণতার ধারায়। সেই ধারাকেই আমি বলেছি, প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের ধারা।

সৃষ্টির আপন গতির ধারা বিশ্লেষণ করলেই বেশ উপলব্ধি করতে পারবে, এর মধ্যেই একটা চেতনা কাজ করছে। ..... এই গতি থেমে নেই। কেউ থামাতে পারছেও না। যে যা কিছু করে যাক, গতি তার কাজ ঠিকই করে চলেছে।

আমি আগেই বলেছি, আশ্চর্য বিশ্বপ্রকৃতিই হলো প্রকৃত আচার্য। সেই আচার্যের (প্রকৃতির) সুরের ঐতিহ্যের ধারা নিয়ে যিনি আসবেন, তিনিই হবেন প্রকৃত গুরু। জন্ম থেকে এই সুর নিয়েই তিনি আসেন। সেই সুরের মাধ্যমে সবাইকে চালিত করে তিনি নিয়ে যান একই পথের পথিক করে। প্রকৃতির সেই

এখানে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, সব ইউনিভার্স থেকেই। ইউনিভার্সের ক্ষমতা নিয়েই এখানে সবাই জন্মগ্রহণ করেছে। অতএব প্রত্যেকেই ইউনিভার্সের বীজ। একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

সুরে নেই কোন ভেজাল। তাই সে সুরজ্ঞের স্বরেও থাকবে না কোন কল্পনা, ধারণা আর অযৌক্তিক কথা। সৃষ্টিধারা যেমন পরপর কার্য কারণ সূত্রে সাজান, সেইভাবে সুসজ্জিত যুক্তিপূর্ণ ধারায় চলবে তাঁর বাণী। সে বাণীতে কারুর মনে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে না। ফোয়ারার মত অনর্গল বেরিয়ে আসবে যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বাণী। তাঁর সে বাণী সর্বজাতির জন্য, সর্বকালের জন্য। তাঁর বাণীতে সর্বদা ঝঙ্কৃত হবে বিশ্ববাণীর সুর। সেই সুরেরই তিনি পথপ্রদর্শক।

গুরু হওয়া তাঁকেই সাজে, যিনি এই বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে মিলিয়ে দিতে পারেন। আমাদের পরবর্তী ব্যবস্থার গুরুভার একমাত্র সেই গুরুই বহন করতে পারেন, যিনি গতিদাতা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন, জন্মের সাথে সাথে গতির পথ দেখাতে শুরু করেছেন।

আশ্চর্য বিশ্বপ্রকৃতিই হলো প্রকৃত আচার্য। সেই আচার্যের (প্রকৃতির) সুরের ঐতিহ্যের ধারা নিয়ে যিনি আসবেন, তিনিই হবেন প্রকৃত গুরু।

তাহলে প্রকৃত গুরু কে? আর কে প্রকৃত গতিদাতা? এটা বুঝতে তোমাদের আর কোন অসুবিধাই রইলো না। এছাড়া 'আমি তোগো লইয়া যামু' -- এসব বলার জন্য অনেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু নিয়ে যাবার ক্ষমতা একটারও নাই, থাকতে পারে না।

গুরু হওয়া তাঁকেই সাজে, যিনি এই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে সবার গতি এক করে মিলিয়ে দিতে পারেন। আমাদের পরবর্ত্তী ব্যবস্থার গুরুভার একমাত্র সেই গুরুই বহন করতে পারেন।

অনন্ত মহাকাশের গতির সুর নিয়ে যে বীজ এই ধরাতলে জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর থেকে আমরা মহাকাশের কথা, মহাকাশের বার্তা, মহাকাশের ধারায় নির্দেশ পাব। তাঁকে তুমি যে অবস্থাতেই ফেল, তাঁর থেকে যে সুফল পাওয়ার, তা সবাই পেয়ে যাবে। তাঁর বাণীতে কখনও কারুর মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে না। দ্বন্দ্ববিহীন হয়ে, মুক্ত হয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই হলেন মুক্তপুরুষ। তাঁর বাণী সর্বদা মুক্তই হবে। যত ঝঞ্ঝাটেই তিনি পড়ুন

দ্বন্দ্ববিহীন হয়ে, মুক্ত হয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই হলেন মুক্তপুরুষ। তাঁর বাণী সর্বদা মুক্তই হবে।

না কেন, অথবা তাঁকে ফেলা হোক না কেন, মুক্তবাণী সদাসর্বদা তাঁর থেকে স্ফূরিত হবেই। তিনি নিয়ে আসেন সাধার সুর, তাই তিনি সাধক। সে সুর সেধে সবাইকে তিনি সুরে টেনে নিয়ে যান। ওস্তাদ খেলোয়ারের মত তিনি যে যেখানে আছে, যে যেপথে চলছে, তাকে সেই পথ দিয়েই এদিক ওদিক করতে করতে অনেক ফাঁক পেরিয়ে 'সম'-এ এনে ফেলেন। প্রত্যেকের পছন্দমত পথ দিয়ে নিয়ে নিজের পছন্দমত পথে নিয়ে আসেন। তিনি কাউকে হতাশ করবেন না, নিরাশ করবেন না। যে যেভাবে থাকুক, খারাপ-ভালোর প্রশ্ন তুলবেন না। অনাবশ্যক ত্যাগ-বর্জনের কথা তুলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবেন না। তিনি একথা কখনই কাউকে বলবেন না, 'তুমি পাপী, তুমি অভিশপ্ত। তোমার মন চঞ্চল।' তিনি বলবেন, 'তুমি তোমার বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা দিয়ে কাজ করে যাও। লাটাই আমার হাতে। ঠিক টেনে নিয়ে মহাসাগরের ধারায় ফেলে দেব। তখন তোমার সব পাক, সব জট খুলে যাবে। বাধামুক্ত হয়ে যাবে। তোমার ভিতর এতদিনের জমাট বাঁধা সব পানাগুলো পাতলা হয়ে খালাস হয়ে যাবে।'

যিনি পূর্ণ হয়েই এসেছেন, মায়ের গর্ভে আসার আগেই যিনি কাজকর্ম শেষ করে এসেছেন, এখানে এসে নূতন করে তাঁকে আর কিছু করতে হয় না। জন্মের থেকে মহান হয়ে যিনি এসেছেন তাঁর ধরণ-ধারণ অন্যরূপ। তাঁর কথাবার্তা, চলাফেরা, ভাব, ভাষা সবই একেবোরে আলাদা ধরণের। তিনি তাঁর অসাধারণ সুর নিয়ে সাধারণের সাথে সাধারণ হয়ে মিশে থাকেন। ভাল করে লক্ষ্য করলেই পার্থক্যটুকু ধরা পড়ে। তিনি মুক্ত হয়েই এসেছেন। তাঁর মুক্তবাণীতে তিনি সকলকে মুক্ত করতে পারেন। ইনিই প্রকৃত গুরু।

তিনি বলবেন, 'তুমি তোমার বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা দিয়ে কাজ করে যাও। লাটাই আমার হাতে। ঠিক টেনে নিয়ে মহাসাগরের ধারায় ফেলে দেব।

এখানে এসে সাধনা করে যারা মহান হন, তাদের টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। এই যেমন রিক্‌শাওয়ালা, ঠ্যালাওয়ালা ২/৪ জনকে নিয়ে যেতে পারে। জন্মের ইতিহাস, পরিবেশ, প্রতিবেশী,

এখানে এসে সাধনা করে যারা মহান হন, তাদের টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। যেমন

রিক্‌শাওয়ালা, ঠ্যালাওয়ালা ২/৪ জনকে নিয়ে যেতে পারে। ..... আর জন্মগত মহান যাঁরা, তাঁরা অসংখ্যকে নিয়ে যেতে পারেন।

আত্মীয়স্বজন -- এদের থেকেই প্রমাণিত হবে, ইনি মহান কি না। আপনিই প্রমাণিত হবে। আলাদা করে প্রমাণ করতে হবে না। আর জন্মগত মহান যাঁরা, তাঁরা অসংখ্যকে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের ক্ষমতার সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠেলাগাড়ীও গাড়ী, গরুর গাড়ীও গাড়ী। মোষের গাড়ীও গাড়ী। আবার রিক্সা, এক্কা, ঘোড়ার গাড়ীও গাড়ী, ট্রেন, প্লেন, জাহাজ, ইঞ্জিন -- এরাও গাড়ী। সব গাড়ীই নিজেরাও চলে, লোকও বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু লোক বহন করা বা টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সবার সমান নয়। কে ধনী, কে দরিদ্র আর কে মধ্যবিত্ত, ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে। এখানকার সাধক, গুরু, মহান, অবতারদের মধ্যে কে কোন্ পর্যায়ে পড়ে, লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যায়।

মনে রেখো, জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষের জন্মগত সুর আর এখানে এসে সাধনা করে অর্জন করা সুরের ধারা এক নয়। জন্মগত সুরজ্ঞের সুর অফুরন্ত। সে সুর কখনও থেমে যায় না। সেখানে কখনও বেসুর বাজে না। তাঁর সেই সুরের স্রোতের টানে তিনি সকলকে টেনে নিয়ে যান মহাকাশের অনন্ত সুরসাগরে। সেখানে সকলকে এক করে দেন। এটাই জন্মগত মহানের কাজ এবং সে কাজেই তাঁর পরিচয়।

ইঞ্জিন আসার আগ পর্যন্ত বগির কি কাজ? গ্রীজ দিয়ে চাকাগুলোকে চালু রাখা যাতে ইঞ্জিনের গতির সাথে গতি মিলিয়ে চলতে পারে। সেইটাই হল, এই নাম, জপ, স্মরণ, মনন। এটা হল একটা পথ। একেই বলে, 'গুরু কৃপাহি কেবলম্।'

জন্মগত মহান এই পৃথিবীতে আসেন টেনে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে সাধারণের সাথে সাধারণ হয়ে মিশে যান এবং সবার কানে কানে বীজমন্ত্র দান করেন আর স্ক্রু এঁটে রেখে দেন। এইভাবে রাখতে রাখতে যাবার সময় একসাথে সব টেনে নিয়ে যান। যেমন ষ্টেশনে একটা একটা করে বগি সাজিয়ে রেখে দেয়। বগি ধাক্কিয়ে ৫০০/১০০০ বগি মাইলখানেক লম্বা করে। তারপর যাবার সময় ঠিক

সময়মত ইঞ্জিন এল হুস্ হুস্ করতে করতে আর ঘটাং করে ধাক্কা দিল বগির সাথে। তখন তার সাথে বগিগুলোকে আটকিয়ে দেওয়া হল। এইবার ইঞ্জিন যেখানে যাবে, বগিগুলোকেও সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এখন ইঞ্জিন আসার আগ পর্যন্ত বগির কি কাজ? গ্রীজ দিয়ে চাকাগুলোকে চালু রাখা যাতে ইঞ্জিনের গতির সাথে গতি মিলিয়ে চলতে পারে। সেইটাই হল, এই নাম, জপ, স্মরণ, মনন। এটা হল, একটা পথ। একেই বলে **'গুরু কৃপাহি কেবলম্'**।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমি তোগো লইয়া যামু

(১৫-০৪-১৯৮৪)

মাতাপিতার সেবা করা, গুরুজনস্থানীয় মানুষ জনের সেবা করাই আমার সেবা। এই কর্ত্তব্য পালন করে আমাকে জানালেই আমি খুশী হবো। এটাই আমার সেবা। ঘরের ছেলেকে বের করে গেরুয়া পরিয়ে, মাথা মুন্ডন করিয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া আমার সেবা নয়। আমার সেবা ভিক্ষুক তৈরী করা নয়। মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেকে সন্ন্যাসী বানানো আমার ধর্ম নয়। মা, বাবার বুক শীতল করে রাখাই আমার ধর্ম, আমার তত্ত্ব।

ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা আশ্রম, মঠ তৈরী করছে, ধর্মের দোহাই দিয়ে যেসব গুরুমহানরা সমাজের পরগাছা হয়ে রক্ত চুষে নিচ্ছে, বেদ বলেছেন, তারা শোষক তারা অসুর।

ভুলে যেও না, ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা আশ্রম, মঠ তৈরী করছে; ধর্মের দোহাই দিয়ে যেসব গুরুমহানরা সমাজের পরগাছা হয়ে রক্ত চুষে নিচ্ছে, বেদ বলেছেন, তারা শোষক, তারা অসুর। আমি তা কখনই করবো না। আমার সন্তানদের মাথায় হাত বুলিয়ে রক্ত চোষার মত যেদিন অর্থোপার্জন করবো, সেদিন আমার জিহ্বা কেটে ফেলে দেব। আমার রক্ত ধর্মের এই অমর্যাদা করবে না না না। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্তে থেক।

আমি গঙ্গার তীরে বাস করছি। এই শহরের যত আবর্জনা মা গঙ্গা বহন করছে। হিন্দুদের কাছে গঙ্গা আজও অপবিত্র হয়নি। আমি নিন্দা, অপবাদ, শত বদনামের আবর্জনা মাথায় করে নিয়ে চলছি। আবর্জনার মধ্যেই আমি সার খুঁজে বার করছি।

জানতো, অসারই সার হয়। অসার থেকে আলো হয়। তার থেকে কত সুফল হয়। আমি অসারের মধ্য দিয়েই আমার পথ তৈরী করছি।

জানতো, অসারই সার হয়। অসার থেকে আলো হয়। তার থেকে কত সুফল হয়। আমি অসারের মধ্য দিয়েই আমার পথ তৈরী করছি। তোমরা আমার সন্তান। বাবার আদেশ, নির্দেশ তোমাদের পালন করতে হবে। তোমরা সংসার ধর্ম রক্ষা করবে। গুরুজনদের আদেশ পালন করবে। যে অর্থ উপার্জন করবে, সেই অর্থ দিয়ে তাদের তৃপ্তিদান করাই তোমাদের প্রথম কাজ। আর বাকী অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় করবে। যে নেশা স্বাস্থ্যকর নয়, যে নেশা অস্বাস্থ্যকর, সেই নেশা বর্জন করবে।

অযথা আলাপ করা, অযথা সমালোচনা করা, অযথা নিন্দা করা যতই মুখরোচক হোক না কেন, সব ভাসিয়ে দেবে। এসবের কোন প্রয়োজন তোমাদের নাই। তোমরা বেদের পূজারী, বেদের সেবক তোমরা। এক মিনিট সময় নষ্ট করবে না। সংসার ধর্ম রক্ষা করে, সংসারের কাজকর্ম শেষ করে বেদের সুরে ডুবে থাকবে। তোমরা এক গুরুর সন্তান, আমার পেটের বাচ্চা তোমরা। এক রক্ত হয়ে তোমরা গড়ে উঠেছ আমার কাছে। সেই হিসাবেই তোমরা ভাইবোনেরা স্থির করবে, কিভাবে বেদের প্রচারের মাধ্যমে বেদের সুরে তোমরা সবাইকে আনতে পার। তার চিন্তাই সবসময় করবে এবং সাথে সাথে অন্যান্য কর্ত্তব্য রক্ষা করবে।

তোমাদের কাছে আমার আর কিছু বলার নাই। তোমরা এই সমাজকে সুস্থ কর। অন্যায়, অবিচার দূর কর। চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ হাহাকার। চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ নির্যাতনের পালা আর অসুর দানবদের খেলা। কিন্তু মনে রেখ, যে মহানাম তোমরা পেয়েছ, সেই নাম, রাম নারায়ণ রাম, এখানকার রাম নারায়ণ রাম নয়। ঐ মহাকাশের কৃষ্ণ --- সেই মহাকাশের কৃষ্ণবর্ণের কৃষ্ণ অনুযায়ী এখানকার কৃষ্ণের নামকরণ করা হয়। তাই মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম। মূলাধার থেকে সহস্রারের পথে অনন্তকোটি পথের গতি আছে সেই সুরে। সেই সুরধারার দিকেই তোমাদের নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই মহানামেই তোমরা তন্ময় হয়ে থাকবে। অনর্গলভাবে জপ করবে।

সর্বাবিস্থায় জপ করতে পারবে। এখানে কোন শুচি নেই, অশুচি নেই। মৃত্যু যদি সর্ব অবস্থায় ঘটতে পারে, জন্ম যদি সর্ব অবস্থায় হতে পারে, তবে দীক্ষাও সর্ব অবস্থায় নেওয়া যেতে পারে।

সর্বাবস্থায় জপ করতে পারবে। এখানে কোন শুচি নেই, অশুচি নেই। মৃত্যু যদি সর্ব অবস্থায় ঘটতে পারে, জন্ম যদি সর্ব অবস্থায় হতে পারে, তবে দীক্ষাও সর্ব অবস্থায় নেওয়া যেতে পারে। অনেকে কাল অশৌচে দীক্ষা নেয় না। কাল অশৌচে জন্ম হয় না? মৃত্যু হয় না? জন্মমৃত্যুতে যদি কোন বাধা না থাকে, দীক্ষাতেও কোন বাধা থাকবে না। তোমরা সদাসর্বদা বেদ প্রচারে নেমে যাও।

মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ছিল বিরাট। এই রক্ত যেন সেই উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। মহাপ্রভুর সব আদেশ নির্দেশ, তাঁর চিন্তাধারা তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম। এ তাঁরই রক্ত। যে রক্ত বহন করছি, এই রক্ত আমার রক্ত নয়। এ স্বয়ং মহাপ্রভুর রক্ত। তোমাদের কাছে ছেড়ে দিলাম মহাপ্রভুর রক্তের কথা। এই রক্ত বলছে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে এক কর। আর আমার কোন বক্তব্য নাই।

আমি গুরু সাজতে চাই না, ভগবান সাজতে চাই না। আমি মহাকাশের একজন সাধারণ কর্মী। আমি তোমাদের হয়ে, তোমাদের ঘরের সন্তান হয়ে কথা বলতে চাই। তিনতলা বাড়ী করেছি সত্যি কথা। নিজে মাথায় ইট বহন করে ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই বাড়ী করেছি। নিজেরা রাজমিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী হয়ে এই বাড়ী তৈরী করেছি। একদিন ছিলাম ছনের ঘরে -- মাটির ঘরে, খড়ের চাল দেওয়া ঘরে। দিনের পর দিন আমি মাটিতে শুয়ে থেকেছি। আজও আমি মাটিতে শুই। সুতরাং শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে আমি পয়সা রোজগার করি না। আমি আশ্রম করিনি, মঠ করিনি। তোমরা কোনদিন ভুল করো না, ভুল বুঝো না। কোনদিন কোন শিষ্যের কাছে আমি হাত পাতিনি। বলিনি, আমার ঘর করতে হবে বা আমার জন্য কিছু আনতে হবে। আমি নিজে খাটাখাটি করে, পরিশ্রম করে যা কিছু তৈরী করেছি। একাধারে লক্ষ লক্ষ লোককে দীক্ষা দিচ্ছি, অপরপক্ষে কর্মের মধ্য দিয়ে আমার জীবনের ধারা চালিত করছি। কর্মই আমার ধর্ম।

আমি গুরু সাজতে চাই না, ভগবান সাজতে চাই না। আমি মহাকাশের একজন সাধারণ কর্মী। কর্মই আমার ধর্ম।

তোমাদের কাছে আমার আর বলার কিছু নেই। আমার সময় নেই। এখন গিয়ে বসে পড়বো।

তোমরা সব আমার সন্তান। বহু সন্তান তো আমার। সব সন্তানকে তো আমার ইঞ্জিনের মতো টেনে নিতে হবে। আমি যদি পড়ে থাকি, সব বগীগুলি পড়ে থাকবে। সুতরাং তোমাদেরও কর্তব্য বাবা যেন কাজ করতে পারেন, বাবা যেন তাঁর পথ দিয়ে আমাদের টেনে নিতে পারেন, সে বিষয়ে সহযোগিতা করা। আমার সব সন্তানকে এই বগীগুলিতে বসিয়ে আমার সুরে সুর মিলিয়ে সেই অনন্তধামে নিয়ে যেতে চাই।

আজ বছর ঘুরে এল। দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু স্মৃতিগুলোই ঘুরে ঘুরে আসছে। একেক বছরে ৩৬৫ দিন। কত ছলচাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য; দুটো পয়সা রোজগারের জন্য মানুষ আজ কত নীচে নেমে গেছে। কিন্তু সময় তোমাদের ক্ষমা করছে না। প্রকৃতি তার গতির ধারায় সবাইকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শেষ সময়ের শেষ প্রান্তে। আমরা সবাই কিন্তু শেষ প্রান্তের পথিক। চলে গেছে কত শত পুরুষ। আজ তারা কেউ নেই। স্মৃতি হয়ে, তাদের স্মৃতির ধারা বহন করে আমরা পড়ে আছি। কিন্তু কাল তোমাদের কালের গ্রাসে নিয়ে যাবেই। প্রকৃতির শেষ উদ্দেশ্য কি বলতো? প্রকৃতি চায়, তোমরা সুন্দরভাবে, সুস্থভাবে পবিত্র চিন্তায় নিজেদের উৎসর্গ করো। প্রকৃতির কর্মীদের দৃষ্টান্ত নিজ নিজ জীবনে নিঃস্বার্থভাবে অনুসরণ করো। প্রকৃতির উদ্দেশ্য, প্রকৃতির রহস্য যেন তোমরা ভালভাবে জানতে পার। কিন্তু একটি বছর যে যায়, হিসাব করে দেখো, কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কত ছল-চাতুরী, কত অপরাধের ভিতর দিয়ে একেকটি বছর পার হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে না জানালেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে প্রকৃতির কাছে নিজ নিজ কাজের জন্য। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে, ক্ষমা নেই। প্রকৃতির এত সৌন্দর্য, সৃষ্টির এত সৌন্দর্য, এত রহস্য, এত কারিকুরি সে কি কারণ

প্রকৃতির শেষ উদ্দেশ্য কি বলতো? প্রকৃতি চায়, তোমরা সুন্দরভাবে, সুস্থভাবে পবিত্র চিন্তায় নিজেদের উৎসর্গ করো। প্রকৃতির কর্মীদের দৃষ্টান্ত নিজ নিজ জীবনে নিঃস্বার্থভাবে অনুসরণ করো।

ছাড়া? এমনিতে তার শেষ হবে না। সৃষ্টিতত্ত্বে প্রতিটি মুহূর্ত্তের মধ্যে রয়েছে বিরাট উদ্দেশ্য। যতদিন পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যের পথে পৌঁছতে না পারবে, ততদিন সেই আবর্তনে বিবর্তনে ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের চলতে হবে।

যতটা পারি, আমি তোমাদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। তাই তোমাদের মহামন্ত্রের সুর দিয়েছি। ঐ মহামন্ত্রের সুর তোমরা অজপা হিসাবে জপ করবে। তোমরা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করবে। যতটা পার ছল-চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকবে। নিন্দা, সমালোচনা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করবে। সেই মহামন্ত্রই তোমাদের একমাত্র সম্বল, সেটাই হল একমাত্র পাথেয়। জীবনের সেই পাথেয় নিয়ে তোমরা এগিয়ে যাও। মাঝি ঘাটে আছে। তরী নিয়ে বসে আছে। পুঁজি থাকলে মাঝি পার করে দেবে। তাই তোমরা সেই পবিত্র চিন্তাতে থাকবে। যেই সম্পদ, যেই বীজ, যেই সম্বল দিয়ে দিয়েছি, এই সম্বল নিয়ে তোমরা চলো। পাথেয় থাকলে পার করতে মাঝি গররাজী হবে না। হে পথিক, হে যাত্রিক নববর্ষে আজ এসে উপস্থিত হয়েছ আমার কাছে, আশীর্বাদ নাও। বাবা তোমাদের আশীর্বাদ জানালেন। তোমাদের তরীতে রয়েছে অনন্ত বিশ্বের সুর। সেই অনন্ত ধামে আনন্দলোকে সুষ্ঠ সহজ সরল মন নিয়ে সবাই যাতে একত্র পৌঁছাতে পারি, তার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে একমাত্র কাজ।

মহামন্ত্রই তোমাদের একমাত্র সম্বল। সেটাই হল একমাত্র পাথেয়। জীবনের সেই পাথেয় নিয়ে তোমরা এগিয়ে যাও। মাঝি ঘাটে আছে। তরী নিয়ে বসে আছে। পুঁজি থাকলে মাঝি পার করে দেবে।

এখানে (এই পৃথিবীতে) যতদিন থাকবে, নিজেদের বাবা মাকে দেখবে। বিবাহিত যারা শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে ঘর করবে। বাবা মাকে কষ্ট দিও না। সেটা বড় দুঃখের জিনিস। যখন যেভাবে পার, তাদের সেবা করবে। বাবা মাকে আদর করবে। তাঁদের

তোমাদের তরীতে রয়েছে, অনন্ত বিশ্বের সুর। সেই অনন্তধামে আনন্দলোকে সুষ্ঠ সহজ সরল মন নিয়ে সবাই যাতে একত্র পৌঁছাতে পারি, তার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে একমাত্র কাজ।

অশ্রদ্ধা করে কথা বলো না; অবজ্ঞার চোখে দেখো না। এ বড় দুঃখের বিষয়। পরে আফশোস করতে হবে। তাই পিতামাতাকে দেখো। এটাই হল গুরুর সেবা। পিতামাতাকে বাদ দিয়ে, সংসার বাদ দিয়ে গুরুসেবা - অন্যেরা বড় মনে করতে পারে, আমি বড় মনে করি না। তাই আগেই বলেছি, পিতামাতা, গুরুজনদের আত্মীয়দের সেবা করলেই হবে আমার সেবা।

তোমরা সুন্দরভাবে জীবনযাপন কর। বাবা যা চান, তোমরা জান। সেইভাবে তোমরা কাজ করে যাবে। বাবার সাথে থাকবে তো তোমরা সবাই? বাবা তোমাদের ছাড়া থাকতে পারবেন না। তোমরাও বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আমি তোমাদের একেবারে কোলে করে নিয়ে যেতে চাই সেই বৃহৎ কাজে, বৃহৎ উদ্দেশ্যের পথে। এত দিন ধরে এসেছ, বাবা তো এই চাই, সেই চাই করে বিরক্ত করেননি তোমাদের। বাবা, তোমাদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেননি। তোমরা কি দাও, না দাও বাবা দেখবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। তোমাদের বাবা তোমাদের সুখ দুঃখের সাথে জড়িয়ে থাকেন। সেই পরমানন্দের সুরে যাতে তোমরা থাকো এবং বাবার আদেশ, নির্দেশমতো চলতে যাতে পার, সেই চেষ্টাই করবে।

তোমরা বাবার আদেশ, নির্দেশ পাথেয় করে নিয়ে চল। তোমাদের আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, ব্যথায় বেদনায় বাবা-মায়ের মত আমি তোমাদের পাশে আছি। আমি তোমাদের কোনদিনও ফেলে দেব না।

আমার কথা নিয়ে যদি কেউ তোমাদের কাছে গিয়ে বলে, - 'বাবা, এই বলেছেন, ঐ বলেছেন' শুনে যেও। কিন্তু তার উপর নির্ভর করে কোন কাজ করবে না। কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়েছে, তারা আমার নামে নানাকথা বলে মানুষকে ঠকাচ্ছে।

নতুন বছর শুরু হল। এই একটি বছর যেন তোমরা নিজেদের গুছিয়ে রাখতে পার। বাবার আদেশ, নির্দেশ পাথেয় করে নিয়ে চল। তোমাদের আপদে বিপদে, সুখে-দুঃখে, ব্যথায়-বেদনায় বাবা-মায়ের মত আমি তোমাদের পাশে আছি। আমি তোমাদের কোনদিনও ফেলে দেব না। লক্ষ

লক্ষ সন্তানের কত দুঃখ-ব্যথা, আঘাত বলে শেষ করা যায় না। যে কাজ নিয়ে আমি এসেছি, সেই কাজ ফেলে যদি ব্যথা-দুঃখ ঘোচাতে যাই, আসল কাজ থেকে সরে যাব না? তাহলে আসল কাজ তো আর করতে পারবো না। তোমরা আমাকে জানাচ্ছ আর আমি বসে বসে তোমাদের রোগ শোক, দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করছি। এতো হাসপাতালে নার্সের কাজ। এই কাজেই যদি আমাকে আটকিয়ে রাখ, তবে তোমরাই একদিন বলবে, 'বাবা, আমরা ভুল করতে পারি, তুমি তো ভুল করবে না।'

বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বৃহৎ কাজে আমি এসেছি। একটা ইঞ্জিন অনেকগুলি বগী টেনে নিয়ে যায় জানতো? ইঞ্জিন যেখানে যায়, বগীগুলোকেও সাথে করে নিয়ে যায়। কিন্তু বগীগুলো কি ইঞ্জিন? তাতো নয়। ইঞ্জিন একটাই থাকে। বাবা যদি তোমাদের ইঞ্জিনের মতো সাথে করে নিয়ে যান, সেটাই হল আসল কাজ। ইঞ্জিনের সাথে সাথে বগীগুলোকেও যদি সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, সবচেয়ে কি ভালো হয় না?

যে মানুষ এখানে চিরদিন থাকবে না, তারজন্য, 'বাবা, একমেটে করে দাও, দু'মেটে করে দাও', দিলাম। দশ বছর পরে আবার 'আর একটা করে দাও।' -- এইভাবে চলছে কয়েককোটি পেটব্যথা, এই ব্যথা, সেই ব্যথা, পরীক্ষা পাশ -- সমানে চলছে একটার পর একটা। সময় তো কম। তাহলে তো ঐগুলি নিয়েই আমায় থাকতে হয়। আসল কাজ করবো কখন? এই যে লক্ষ লক্ষ জীবনের দুঃখ, ব্যথা-বেদনা-বারবার করে আমার কাছে আসছো আর যাচ্ছ, এই সমস্যার সমাধান আর কেউ বের করতে পারলো বলে আমার মনে হয় না। বাচ্চা বয়স থেকে এই করে আসছি। কোন্ কাজে থাকবো বল? তোমাদের রোগ শোকের মধ্যে থাকবো? না, আসল কাজে থাকবো? চিরদিন চিরযুগ যদি এক সংসারে থাকতে পারি, সেটা ভালো না? আমি তাই চাই। চিরদিন যেন আমরা এমনি করে থাকতে পারি।

তোমরা আমাকে জানাচ্ছ আর আমি বসে বসে তোমাদের রোগ, শোক, দুঃখ দূর করার ব্যবস্থা করছি। এতো হাসপাতালে নার্সের কাজ। এই কাজেই যদি আমাকে আটকিয়ে রাখ, তবে আসল কাজ করবো কখন?

তোমরা রোগ, শোক, ব্যথা-বেদনার ঊর্দ্ধে উঠে যাবে। বাবার প্রাণের সাথে মিশে থাকবে। আমরা যেন চিরদিন একত্র হয়ে এক সংসারে থাকতে পারি, সেটাই তো আমাদের কামনা? তোমরা সেটাই তো চাও? ব্যথা-বেদনা, রোগ, শোক নিয়ে এলে অনেক সময় যতটা পারি করি। আবার অনেক সময় ঘোরাই, জান? যখন দেখি, ভাল হবে না, মরে যাবে; তখন ঘোরাই। বলি, 'দেখি, কি করতে পারি?' এমতাবস্থায় আমি কি করি বলতো? ছল-চাতুরী করতে পারবো না, মিথ্যা কথা বলতে পারবো না; তখনই ঘোরাই, এছাড়া উপায় নাই। বলছে, 'পেটব্যথা।' আমি দেখছি 'ক্যান্সার।' কি করে বলি বলতো? বললে, সে তো মরবেই। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে পুলেগুলিও প্রায় শেষ। আমাকে এমন এক একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয় যে, কি বলবো? এগুলো থেকে আমাকে ছেড়ে দেবে বল? লিখে দেবে বল?

চিরদিন চিরযুগ যদি এক সংসারে থাকতে পারি, সেটা ভালো না? আমি তাই চাই। চিরদিন যেন আমরা এমনি করে থাকতে পারি।

প্রকৃতির উদ্দেশ্যের ধারাপাতা ধরে ধরে আসল কাজের পথিক হিসাবে যান্ত্রিক হিসাবে আমি এসেছি। তোমাদের বাবা পাঁচ বছর থেকে সাত বছরের মধ্যে দীক্ষা দেওয়া শুরু করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম আর একজনও আছে কি না, তোমরা দেখো তো? জেনে আমাকে জানাবে। এ আমার অহঙ্কারের কথা নয়। বাবা হিসাবে ছেলের কাছে কথা বলছি। পাঁচ বছর থেকে সাত বছরে আদিবেদের কথা অনর্গল বলি। এতটুকু বাচ্চা --- শিষ্য বাড়ী গিয়ে তিনবার হিসি করে দিয়েছি। পাঁচবছর বয়সে যে দীক্ষা দিচ্ছে, তার আরও আগে প্রস্তুতি ছিল। প্রস্তুতি না থাকলে পাঁচবছর বয়স থেকে দীক্ষা দিতে পারে না। আমার মাষ্টারমশায় কৃষ্ণধন সাহা, তিনি আমাকে ক্লাস 'টু' তে পড়িয়েছেন, ক্লাস 'থ্রি' তে পড়িয়েছেন, সাতটা লেটার পেয়েছেন। আনন্দ মাষ্টার, তিনি আমাকে পাঠশালায় পড়িয়েছেন। সেইসব মাষ্টার মশায়দের যখন ঐ শিশু বয়সেই দীক্ষা দিচ্ছি, আগে থেকে নিশ্চয়ই

তোমাদের বাবা পাঁচ বছর থেকে সাত বছরের মধ্যে দীক্ষা দেওয়া শুরু করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম আর একজনও আছে কি না, তোমরা দেখো তো? জেনে আমাকে জানাবে। এ আমার অহঙ্কারের কথা নয়। বাবা হিসাবে ছেলের কাছে বলছি।

প্রস্তুতি ছিল। কত আগে থেকে থাকবে? দুই বছর, তিন বছর থেকে তো থাকতে পারে না। আরও অনেক আগে থেকে ছিল। তা না হলে পাঁচ বছর বয়সে দীক্ষা দিতে পারে না। তাই তো 'বালক ঠাকুর'। সবাই বালক বালক করতো তাই। না হলে 'বালক ঠাকুর' তো আমার নাম নয়। 'বালক ঠাকুর' (তোমাদের বাবা) যে তোমাদের নিয়ে যাবেন, এটা তো তিনি জানেন। আমি একটা বাচ্চাকেও রেখে যেতে রাজী নই। সবগুলোকে একেবারে গাড়ীতে বসিয়ে রাখবো। তারপর খ্যাচ্ খ্যাচ্ খ্যাচ্ খ্যাচ্ ..... করে নিয়ে যাব। ভালো লাগে না?

আমার সন্তান তোমরা। তোমরাই তো আমার চোখের মণি। আমার পেটের বাচ্চা তোমরা। তোমরা আমার অন্তরের। তবু তোমাদের দুঃখ দেখে পারি না সামাল দিতে। এটা বলি, ওটা বলি, হাসপাতাল খুঁজি। আমাকে আসল কাজ তো করতে হবে। লাইন ছাড়া তো ট্রেন চলে না। ট্রেন লাইন ছাড়া হয়ে গেলে কি দুরবস্থা বলতো? তাই তোমাদের কাছে বলছি, যে লাইনে আছি, তা থেকে যদি সরে পড়ি, তবে আমি তো ডুববোই, আমার বালবাচ্চা সব নিয়ে ডুববো। সুতরাং এতবড় দায়িত্ব আমার কাঁধে যে আমি, কিছুতেই সেই দায়িত্ব থেকে সরে যেতে চাই না। আমি সবাইকে সেই পথের পথিক করে নিয়ে যেতে চাই। কে নিয়ে যেতে পারেন জান? একমাত্র জন্মের থেকে যিনি হয়ে আসেন, যিনি পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আসেন, বুঝতে পেরেছ? তোমাদের বাবা আর কত বলবে? 'আমি তোগো লইয়া যামু'-- এসব কথা বলার জন্য অনেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু নিয়ে যাবার ক্ষমতা একটারও নাই, থাকতে পারে না। শুধু আমি আছি তোমাদের পাশে। তোমরা আছ আমার অন্তরে।

যে লাইনে আছি, তা থেকে যদি সরে পড়ি, তবে আমি তো ডুববোই, আমার বালবাচ্চা সব নিয়ে ডুববো। সুতরাং এতবড় দায়িত্ব আমার কাঁধে যে, আমি কিছুতেই সেই দায়িত্ব থেকে সরে যেতে চাই না। আমি সবাইকে সেই পথের পথিক করে নিয়ে যেতে চাই।

কত নিন্দা, কত অপবাদ, কত বদনাম দিচ্ছে, কত অপপ্রচার করছে। সব কাঁধে করে নিয়ে চলেছি। সাথে আছে মহাকাশের মহানাম

মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। শিব নিজ হস্তে অনাহতে লিখলেন এই নাম। দ্বারে দ্বারে সর্বত্র মহান্ অর্থবোধে ধ্বনিত হ'ল এই মহানাম। মূলাধার থেকে মণিপুরে, আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রারে সর্বত্র ধ্বনিত হ'ল সেই একই সুর, একই ধ্বনি, সেই সুরধ্বনি। বল সবে বারে বারে সেই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। আকাশ, বাতাস, মাটির সমন্বয় সুরে এই নাম। জগতের সত্যতা ধরে রেখে সর্বশাস্ত্রের সর্বকালের সারমর্মের কথা এই নাম, বারে বারে বল সবে রাম নারায়ণ রাম। বিশ্বের সর্বত্র ঘরে ঘরে প্রচার কর এই মহানাম। এই মহানামের মাঝে নিজেদের উৎসর্গ করো।

কে নিয়ে যেতে পারেন জান? একমাত্র জন্মের থেকে যিনি হয়ে আসেন, পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আসেন, বুঝতে পেরেছ? এ ছাড়া 'আমি তোগো লইয়া যামু'-- এসব কথা বলার জন্য অনেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু নিয়ে যাবার ক্ষমতা একটারও নাই, থাকতে পারে না। শুধু আমি আছি তোমাদের পাশে। তোমরা আছ আমার অন্তরে।

আজ্ঞাচক্রে মহানাম রাম নারায়ণ রাম। জাগাও তোমরা এই স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। ত্যাগের মাধ্যমে, স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে কর সবে নাম রাম নারায়ণ রাম। মূলাধারে ..... সহস্রারে দেহবীণা যন্ত্রের সপ্তসুরে বাজাও সবে এই মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। শিব বললেন জনসমক্ষে জীব কল্যাণে এই নাম রাম নারায়ণ রাম। মহাকাশে যাত্রা করেছে যাত্রীরা। মহাকাশের যাত্রাপথে সাথের সাথী এই মহানাম রাম নারায়ণ রাম। এই সুরধ্বনির ধ্বনি কানে শুনলেও মুক্তি হবে। এ হচ্ছে ন্যায়ের দন্ড। এ কথা বলবে। বল সবে রাম নারায়ণ রাম।

মৃত্যু যখন আছে, সেই মৃত্যুর পথে আগেই নিজেকে উৎসর্গ করো। দেহবীণাযন্ত্রে বাজাও সেই গীতির গান, সেই মহানাম, রাম নারায়ণ রাম।

বারে বারে বলছি একই কথা। মহান্ অস্ত্র এই রাম নারায়ণ রাম। এই অস্ত্রের মত অস্ত্র আর নেই। এই মহানামের সুরধারা যেদিক দিয়ে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। শুধু সংসার ধর্মটুকু রক্ষা করে দিবারাত্র কর এই নাম, মহাকাশের মহানাম মহান্ অর্থবোধে মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। মৃত্যু যখন আছে, সেই মৃত্যুর পথে আগেই নিজেকে

উৎসর্গ করো। এই গানের সাথের সাথী হয়ে দেহবীণাযন্ত্রে বাজাও সেই গীতির গান, সেই মহানাম, সেই রাম নারায়ণ রাম। তোমরা এই মহানামকে সাথের সাথী করে ভাসিয়ে দিয়ে যাও গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে, সর্বত্র দ্বারে দ্বারে। তোমরা সর্ব অবস্থায় তন্ময় হয়ে থাক এই মহানামে। শত ব্যথা-বেদনা তোমাদের জীবনের জয়গানের যাত্রাপথের সাথের সাথী। এগুলো কোনদিনই তোমাদের ছাড়বে না। এদের সাথী করে তোমরা এগিয়ে যাবে। হে পথিক, হে যাত্রিক মহানামকে পাথেয় করে যাত্রা করো মহাকাশের পথের পথে। তাই তোমরা কাম (কাজ) করবে, নাম করবে। একই নাম বিরাট অর্থবোধে এই রাম নারায়ণ রাম।

হঠাৎ মনে পড়লো মনাই ফকিরের কথা। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছি। খুব বড় সাধক ছিলেন মনাই ফকির। সবসময় নামে তন্ময় হয়ে থাকতেন। সিদ্ধি খেতেন। মুসলমানদের বড় দরগা ছিল মনাই ফকিরের দরগা। ১৭০ বছর বয়স ছিল মনাই ফকিরের। লোকনাথ বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হোত। সারাদিন সুপারি বাগে বসে থাকতেন। রাত্রি ২টার সময়ে আসতেন আমার কাছে। আমার তখন ৯ বছর বয়স। আমার কাছে এসে বলতেন, 'বাচ্চা, তুই আমারে কিছু দে।' আমি চুপ করে থাকলে বলতেন, 'আমারে কিছু দিবি না?' দুই ভ্রু-র মাঝখানে আঙুল দিয়ে বলতেন, 'এখানে ফুটায়ে দে।'

শত ব্যথা-বেদনা তোমাদের জীবনের যাত্রাপথের সাথের সাথী। এগুলো কোনদিনই তোমাদের ছাড়বে না। এদের সাথী করে তোমরা এগিয়ে যাবে। হে পথিক, হে যাত্রিক মহানামকে পাথেয় করে, যাত্রা করো মহাকাশের পথে।

আমি বলতাম, 'ফকির, তুই বস্ (বসে থাক)। তারপর শুরু করতেন, আল্লার গান। সে কি গান। কি গভীর সুর, আল্লারে, আল্লারে .....। একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। ১৭০ বছর বয়সে এই সুর দিতেন। আল্লার গান গাইতে গাইতে একেবারে পাগল হয়ে যেতেন। আবার ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই চলে যেতেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটু বললাম তাঁর কথা। আজ এই থাক। বল সবে রাম নারায়ণ রাম।

পরপারের ঠিকানা

পাঠশালার আনন্দ মাষ্টার, গুরুচরণ পন্ডিত ও শিশু ঠাকুর

(০১-০২-১৯৭৬)

শিশু ঠাকুর ঃ- মাষ্টার মশায়, আপনারে যদি এক ঘর থিকা (থেকে) আরেক ঘরে নেয়, এই বাড়ী থিকা আরেক বাড়ীত নেয়, তবে আপনেই তো গেলেন। এই বাড়ী থিকা যে গেলেন, ভুইলা যাইবেন গিয়া? এই কথা কেউ ভুলে?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- ভুইলা যামু কিয়ের লইগা?

শিশু ঠাকুর ঃ- আপনে এই বাড়ী থিকা দুলালগো বাড়ী গেলেন; দুলালগো বাড়ী থিকা কল্লোলগো বাড়ীত গেলেন। কল্লোলগো বাড়ী থিকা আরেক বাড়ীত গেলেন। ভুইলা যাইবেন গিয়া? কইতে পারবেন না? এই কয়ডা বাড়ীত গিয়া শেষ বাড়ীতে যহন (যখন) গেলেন, কইতে পারবেন তো?

মাষ্টার মশায়, আমরা তো কেবল ঘরে ঘরে আইছি। পেটের মধ্যে এক ঘর। পেটের থিকা পইরা আরেক ঘর। ... পেটের আগে যে ঘরে আছিলেন, সেডা কোথায় আছিল? সবই ভুইলা গেছেন গিয়া?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- হ, হেইডা (সেইটা) কইতে চেষ্টা করুম।

শিশু ঠাকুর ঃ- মাষ্টার মশায় আমরা তো কেবল ঘরে ঘরে আইছি। পেটের মধ্যে এক ঘর। পেটের থিকা পইরা আরেক ঘর। বুঝলেন তো? আগে যে ঘরে আছিলাম, কইতে পারুম না? এইডা ভুইলা গেলে কেম্নে হইব? হেডা

তো ভাল হইব না। পেটের আগে যে ঘরে আছিলেন, সেডা কোথায় আছিল? সবই ভুইলা গেছেন গিয়া?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- হ, হেইডা মনে নাই।

শিশু ঠাকুর ঃ- আগে যে বাপ মায়ের কাছে আছিলেন, হেইডা ভুইলা গেছেন গিয়া?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- হ, ভুইলা গেছি।

শিশু ঠাকুর ঃ- মাষ্টারমশায়, আপনি সেই পেটের মধ্যে আছিলেন না? ... তার আগের টায় আপনি গেলেন কই? তার আগে কোথায় আছিলেন? দুই চাইরটা ঘরের কথা কইতে পারবেন না?

এমা! জ্যাঠিমা, খুড়িমার কথা মনে থাহে (থাকে) না? কাকা, জ্যাঠার কথা মনে থাহে না? পিসীমার কথা মনে থাকবো না? ছোটবেলার পিসীমা, মাসিমার কথা মনে নাই?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- হেইগুলি (সেইগুলি) তো মনে থাহে।

শিশু ঠাকুর ঃ- মাষ্টার মশাই, আপনিই তো আইলেন ঘুইরা। আপনি সেই পেটের মধ্যে আছিলেন না?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- হ, আমিই তো আছিলাম।

শিশু ঠাকুর ঃ- হেইডা গেল কই? ভুইলা গেলেন কিয়ের লইগা? তার আগেরটায় আপনি গেলেন কই? তার আগে কোথায় আছিলেন? দুই-চাইরটা ঘরের কথা কইতে পারবেন না?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- এমা, কইতে তো পারতাছি না।

শিশু ঠাকুর ঃ- আমি একটা ক্যান (কেন), পঞ্চাশটা কইতে পারুম।

আনন্দ ঠাকুর ঃ- তুমি পারবা? তুমি তো অন্যরকম দেখতাছি।

শিশু ঠাকুর ঃ- ঐ জায়গায় একখান পর্দা আছে মাষ্টারমশায়। ঐ পর্দাটা সরাইতে হইব। ঐ পর্দাটা আছে বইলাই দেখতে পাইতেছেন না।

অন্যরকম কি? হগলই (সকলেই) তো এক। আপনিও যে ঘর থিকা বাইরাইছেন, আমিও সেই ঘর থিকা বাইরাইছি। আপনি যেই পেটে আছিলেন, আমিও হেই (সেই) পেটেই তো আছিলাম।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- তাইলে অহন (এখন) উপায়? ঐডা আমি কেম্নে জানুম?

শিশু ঠাকুর ঃ- ঐ জায়গাটায় একখান পর্দা আছে মাষ্টারমশায়। ঐ পর্দাটা সরাইতে হইব। ঐ পর্দাটা আছে বইলাই দেখতে পাইতেছেন না।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- এই পর্দাটা? এই পদর্াটা সরাইলে দেখতে পামু?

শিশু ঠাকুর ঃ- একখান পর্দা যদি গিয়া দেওন (দেওয়া) যায়, আড়াল হইয়া যায় না? ঐ পর্দাটার আড়াল আছে বইলাইতো দেখতে পাইতেছেন না।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- ঐ পর্দাটা কেম্নে যাইব?

শিশু ঠাকুর ঃ- পর্দাটা তো এম্নে যাইব না। এমন আইট্কা গেছে আপনাগো যে, এইডা এম্নে যাইব না। এইডা সরাইতে গেলে অনেক হ্যাঙ্গামা করতে হইব।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- তুমি সরাইয়া দেও না।

শিশু ঠাকুর ঃ- এই সরাইয়া দেও না, সরাইয়া দেও না, কইতে কইতে হগলই (সবাই) আইতে (আসতে) আরম্ভ করছে।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- তোমারে যত দেখতাছি, আমি অবাক হইতাছি। আমাগো জীবনডা কেম্নে কি হইব?

শিশু ঠাকুর ঃ- একটা জীবন কি মাষ্টার মশায়? আরেকটা জীবন, আরেকটা জীবন, কত যে জীবন।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- আবার কি এহানে (এখানে) আইতে হইব?

শিশু ঠাকুর ঃ- এই তো নিয়ম মাষ্টার মশায়। আইতে আইতে যায়। যাইতে যাইতে আহে (আসে)। আবার আহে, আবার যায়। এই আওয়া যাওয়াই তো চলছে। মাষ্টারমশায়, আপনে বাজারে যান না? আবার বাড়ীতে আহেন (আসেন) না ফিরা? আবার আরেক বাড়ীতে যান তো?

এই তো নিয়ম মাষ্টার মশায়। আইতে আইতে যায়। যাইতে যাইতে আহে (আসে)। আবার আহে, আবার যায়। এই আওয়া যাওয়াই তো চলছে মাষ্টারমশায়।

আনন্দ ঠাকুর ঃ- হ যাই।

শিশু ঠাকুর ঃ- আপনে মাষ্টার মশায় স্কুলে গিয়া আবার বাড়ীত ফিরেন না?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- হ, ফিরিতো।

শিশু ঠাকুর ঃ- এহানেও (এখানেও) তো তাই। এইহান (এখান) থিকা যখন যাইবেন, আবার এইহানে আইয়া পড়বেন।

আনন্দ ঠাকুর ঃ- এইডা কি সব সময় আইতে হইব?

শিশু ঠাকুর ঃ- এইডা যদি বাড়ী হয়, তাইলে এহেনেই তো ফিরবেন।

আনন্দ ঠাকুর ঃ- এই বাড়ী থিকা কেম্নে যামু?

শিশু ঠাকুর ঃ- আপনে মাইয়ারে বিয়া দিলে মাইয়া (মেয়ে) ঐ বাড়ীডারে বাড়ী কয় না? তখন এই বাড়ীডারে কয় বাপের বাড়ী। বিয়ার আগে কয় আমাগো বাড়ী। আর বিয়া হইয়া গেলে কয় বাপের বাড়ী। কয় না?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- হ, তাতো কয়।

শিশু ঠাকুর ঃ- মাইয়ারে গোত্রান্তর কইরা দেন না? আরেক গোত্রে ছাইড়া দেন না?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- তাতো ছাইড়া দেই।

শিশু ঠাকুর ঃ- আপনার মাইয়া কি কয়?

আনন্দ মাষ্টার ঃ- কয় বাপের বাড়ী।

শিশু ঠাকুর ঃ- নিজের বাড়ী ফেলাইয়া, নিজের বাড়ী না কইয়া বাপের বাড়ী কয় কিয়ের লইগা? ঐ বাড়ীডাই তার নিজের বাড়ী হইয়া গেল গা? আরে এই রহমই তো (এইরকমই তো) হয় মাষ্টার মশায়। আপনে যতক্ষণ এই বাড়ীতে থাকবেন, এই বাড়ীর কথাই কইবেন। আপনে যান গিয়া।

আরে এইরহমই (এইরকমই) তো হয় মাষ্টারমশায়। আপনে যতক্ষণ এই বাড়ীতে থাকবেন, এই বাড়ীর কথাই কইবেন। আপনে যান গিয়া।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- কেম্নে যামু? কেম্বায় (কি করে) যামু? ওই, কইয়া দেও কেম্বায় যামু? যামু কেম্নে?

শিশু ঠাকুর ঃ- পথ আছে তো। পথ আছে একখান। সেই পথ ধইরা যাইতে হইব। সেই পথ ধইরা ধইরা যাইতে পারলে কোন চিন্তা নাই। তা নইলে যাইতে পারবেন না, মাষ্টারমশায়।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- পথ? হেই (সেই) পথ দেখাইয়া দেও। আমাগো পথ দেখাইয়া দেও। আর ফিরতে চাই না এহানে। এহানে আর ফিরতে চাই না। বড় কষ্ট, বড় কষ্ট। কি কষ্ট। ওই, তুমি আমারে পার কইরা দাও। পার কইরা দাও। তুমি আমার 'পরপারের কান্ডারী।' আমারে তাড়াতাড়ি পার কইরা দেও। এহানে আর ফিরতে চাই না। এহেনে (এখানে) কষ্টের ঠেলায় আর পারি না। পার কইরা দেও। লও, আমারে লইয়া যাও।

আইচ্ছা মাষ্টারমশায়, পথ দেহাইয়া (দেখাইয়া) দিমু নে। পথ দেহাইয়া দিলে ঐ পথেই যাইবেন। ঐহানেই বাড়ী হইয়া যাইব গা (যাবে গিয়ে)। আর আইতে হইব না।

শিশু ঠাকুর ঃ- আইচ্ছা মাষ্টারমশায়, পথ দেহাইয়া (দেখাইয়া) দিমু নে। পথ দেহাইয়া দিলে ঐ পথেই যাইবেন। ঐহানেই বাড়ী হইয়া যাইব গা (যাবে গিয়ে)।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- আইচ্ছা, তুমি আমারে বাঁচাইলা। তুমি বাঁচাইলা। আমারে কি করতে হইব?

শিশু ঠাকুর ঃ- আছে। পথঘাট আছে। নিয়ম আছে। ঠিয়ানা (ঠিকানা) আছে। ঠিয়ানা থাহে (থাকে) না? ঐহানের (ঐখানের) ঠিয়ানা আছে।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- তোমার ঠিয়ানা আমারে দিবা?

শিশু ঠাকুর ঃ- আমি তো ঠিয়ানা দেই মাইন্সেরে(মানুষকে)। আমি তো ঠিয়ানা দিতেই আইছি। (বাচ্চা বয়সের কথা বলছি)।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- (ফুল বেলপাতা লইয়া) কই ও, আমারে ঠিয়ানাটা দেও। আমার কানে কিছু দেও না। আমার ঠিয়ানাটা দেও, আমার ঠিয়ানাটা?

ঠিয়ানাটা (ঠিকানাটা) নিবা? আইচ্ছা, আহ (এস)। কানে মন্ত্র দিলাম। ঠিয়ানাটা দিলাম। (পাঁচ বছর বয়স)।

শিশু ঠাকুর ঃ- ঠিয়ানাটা নিবা? আইচ্ছা, আহ (এস) কানে মন্ত্র দিলাম। ঠিয়ানাটা দিলাম। (পাঁচ বছর বয়স)।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- এই ঠিয়ানাটা নিলে আর ফিরতে হইব না?

শিশু ঠাকুর ঃ- আর আইতে হইব না, মাষ্টারমশায়।

আনন্দ মাষ্টার ঃ- তু তু তুমি আমাগো লগে থাকবা তো? তুমি? তুই থাকবি তো?

শিশু ঠাকুর ঃ- আমি তো থাকবোই। আমি না গেলে কেম্নে হইব? আমি লগে লগে যামু। মাষ্টারমশায়, আমি লগে লগে যামু।

(শ্রীশ্রী ঠাকুরের আরেকজন মাষ্টার মশাই ছিলেন গুরুচরণ পন্ডিত। তিনিও শিশু ঠাকুরের সাথে অনেক কথা বলেছেন ও দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।)

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- (শিশু ঠাকুরের প্রতি) - আরে হুনছি (শুনছি), তুমি তো পার করতাছ। আঁই (আমি) তো গুরুচরণ পন্ডিত। তুমি তো জান, কিষ্টধন, সনাতন, ক্ষেত্র হগলই তো আমার ছাত্র। উজানচর কৃষ্ণনগরে যতজন আছে, কয়েকজন ছাড়া হগ্‌গলই (সবাই) তো আমার ছাত্র। তুঁইও কয়দিন পড়ছো আমার এহানে (এখানে)।

আরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে। যা দেখলাম, তুমি নদীর উপরে দৌড় দিলা। যা একখান দৌড় দিলা না, ঐ দৌড় দেইখা তো আমি হাঁ মাইরা গেছি গা।

শিশু ঠাকুর ঃ- আজ্ঞে হ্যাঁ। (৭ বছর বয়স)

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- দেখ, আমি তো বুড়া হইয়া গেছি গা। আর তো কিছু দেখি না। ভগবান তো দেখি নাই। তোমারে তো দেখছি। হেদিন (সেদিন) গেছিলাম নদীর পারে। যা দেখলাম - দেইখা আমার মাথাটা এক্কেরে ঘুইরা গোলাইয়া গেছে।

শিশু ঠাকুর ঃ- ক্যান্ (কেন)?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- আরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে। যা দেখলাম, তুমি নদীর উপরে দৌড় দিলা। যা একখান দৌড় দিলা না, - ঐ দৌড় দেইখা তো আমি হাঁ মাইরা গেছি গা। এমা, দৌড় দিয়া তুমি কই গেলা, আবার আইলা। কচুরীপানা উঠাইলা, কচুরীফুল তুইলা লইয়া আইলা। আমি দেইখা কি কমু - আমার মাথাটা এক্কেবারে ঘুইরা গেছে। ভাবতাছি, এতো ভগবান ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তুমি কেম্‌নে এইটা করলা?

শিশু ঠাকুর ঃ- কি কন মাষ্টার মশাই? এতবড় নৌকাটা জলের উপরে থাহে (থাকে) না? ষ্টীমারটা জলের উপরে থাহে না? মাইন্‌সের ওজন তো নৌকা, ষ্টীমারের ওজনের চেয়ে কম মাষ্টারমশাই?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ, তাতো ঠিকই। মাইন্‌সের ওজন তো কম।

শিশু ঠাকুর ঃ- তবে ক্যান্ আপনি নদীর উপরে দৌড়াইতে পারবেন না? কিয়ের লইগা? ষ্টীমারের ওজন কতো? নৌকাটার কত ওজন? এইগুলি যদি নদীর উপর দিয়া যাইতে পারে, তবে আপনি যাইতে পারবেন না, কিয়ের লইগা?

কি কন মাষ্টারমশাই? এতবড় নৌকাটা জলের উপরে থাহে (থাকে) না? ষ্টীমারটা জলের উপরে থাহে না? মাইন্‌সের ওজন তো নৌকা, ষ্টীমারের ওজনের চেয়ে কম মাষ্টার মশাই।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- আমি তো কেবল ডুইবা যাই।

শিশু ঠাকুর ঃ- আপনার মন তো ডুইবা যাওনের, ডুইবা যাওনের মন যাদের থাহে, তারা ডুইবা যায়।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- আরে হাচা (সত্য), হাচাই। ডুইবা যাওনের মনটাই তো বেশী। কেবলই মনে হয়, আরতো উঠতে পারুম না। হের লইগাই (তারজন্যই) ডুইবা যাই।

শিশু ঠাকুর ঃ- আমার মনটাতো তা নয়। আমার মন ডুইবা থাহে না। উইঠা (উঠে) যায়। স্বপ্নের মধ্যে দেহেন (দেখেন) না, উড়তে পারে? তখন মনে মনে উড়তে থাহে। তাই উড়তে পারে।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- তাইলে, আমারে পথ দেহাইয়া (দেখাইয়া) দিবা না

তুমি? আমারে দিবা না কিছু? তুমি আমার ছাত্র তো, আমার সন্তান তো।

শিশু ঠাকুর ঃ- দিমু দিমু। আপনারে পথ দেহামু।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- তুমি সব বুঝ না?

শিশু ঠাকুর ঃ- হ্যাঁ, আমি সব বুঝি।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- আইচ্ছা, তুমি আর আইবা না ইহানো (এখানে)?

শিশু ঠাকুর ঃ- না, আমি আর আইতাম না।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- আইচ্ছা, তুমি ভগবানের লগে কথাবার্তা কও?

শিশু ঠাকুর ঃ- না, ভগবানের লগে কথাবার্তা কমু কিয়ের লইগা? ভগবানের ঠ্যাহা (ঠ্যাকা) হইলে আমার লগে কথা কইব। আমি তার লগে কথা কইতে যামু কিয়ের লইগা? হ্যাই (সেই) আমার লগে কথা কইব।

ভগবানের ঠ্যাহা (ঠেকা) হইলে আমার লগে কথা কইব। আমি তার লগে কথা কইতে যামু কিয়ের লইগা?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- তাইতো, ভগবানের ঠ্যাহা? না, আমাগো ঠ্যাহা? [শিশু ঠাকুররে জিগায়] (জিজ্ঞাসা করে)।

শিশু ঠাকুর ঃ- ঠ্যাহা (ঠ্যাকা) ভগবানরে। আমরা তো মানুষ। পাগল ছাড়া কেউ ভগবানরে ডাহে (ডাকে)?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- এ্যাঁ? যারা ভগবানরে ডাহে, তারা পাগল?

শিশু ঠাকুর ঃ- হ। পাগল ছাড়া কেউ ভগবানরে ডাহে? আমরা

পাগলামি করতে যামু কিয়ের লইগা? কারণ জন্মটা যে নিছেন আপনে মাষ্টারমশায়, আপনে কি আপনারে জন্ম দিছেন?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- না না না।

শিশু ঠাকুর ঃ- হ্যার (তাঁর) ঠ্যাহায় (ঠেকায়) আমাগো জন্ম দিছে। হ্যার কামে (কাজে) আমাগো জন্ম দিছে। মাইন্‌সের কামে (কাজে) জন্ম দেয় নাই। হ্যার কামেই আমাগো জন্ম দিছে। মাষ্টার মশায়, আপনে কি নিজের ইচ্ছায় আইছেন আর গেছেন।

জন্মটা যে নিছেন আপনে মাষ্টারমশায়, আপনে কি আপনারে জন্ম দিছেন? ... হ্যার (ভগবানের) ঠ্যাহায় (ঠেকায়) আমাগো জন্ম দিছে।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- না, আমি যামু কিয়ের লইগা?

শিশু ঠাকুর ঃ- যে পাঠায়, হ্যাই তো লইয়া যাইব। মাষ্টারমশায়, আপনারা কাম করাইতে হইলে পয়সা দেন না? কোন কামের জন্য লোক পাঠাইলে ভাড়া দিয়া দেন না?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ। তাতো দেই।

শিশু ঠাকুর ঃ- যে বেডারে (লোককে) পাঠান, ঐ যে মুনিশ, না কি কয়, তারে ভাড়া দিয়া দেন না?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ। ভাড়াডা দিয়া দেই।

শিশু ঠাকুর ঃ- ভাড়াটা দেন তো?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ।

শিশু ঠাকুর ঃ- হ্যায় (ভগবান) যে আমাগো ভাড়া দিয়া আনছে। হ্যায়ই (সেই) লইয়া যাইব গা।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- এমুন (এরকম) কথা তো শুনি নাই।

শিশু ঠাকুর ঃ- আপনে যখন আইছেন মাষ্টারমশায়, দুধ খাইছেন না?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ, খাইছি।

শিশু ঠাকুর ঃ- মাষ্টারমশায়, মায়ের দুধ আপনে আনছিলেন?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- না না না। ঐডা ভগবানই দিছে।

শিশু ঠাকুর ঃ- ভগবান যদি মায়ের দুধ দিয়া থাহে, (থাকে), তারপর যখন দাঁত হইল, তখন আপনে দাঁতের খাওয়া খাইছেন না?

ভগবান যদি মায়ের দুধ দিয়া থাহে (থাকে), তারপর যখন দাঁত হইল তখন আপনে দাঁতের খাওয়া খাইছেন না? ... তাইলে আপনে আইলে যদি এতকিছু দেয়, আপনারে নেওনের লইগা হ্যাই (ভগবানই) তো দেখবো।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ, সুপারি পর্যন্ত চিবাইছি। সুপারি।

শিশু ঠাকুর ঃ- তাইলে দাঁতের খাওয়া খাইছেন। অহন (এখন) তো দাঁত নাই। অহন?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- অহন তো চুইষা চুইষা খাই।

শিশু ঠাকুর ঃ- খান তো মাষ্টারমশাই। হগ্‌গলই তো আছে। একি আপনে আনছিলেন?

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- না না। আমি আনুম কিয়ের লইগা?

শিশু ঠাকুর ঃ- তাইলে আপনে আইলে যদি এতকিছু দেয়, আপনারে নেওনের লইগা হ্যাই তো দেখবো।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- তাইলে অহন কি করতাম?

শিশু ঠাকুর ঃ- একখান কাম করতে হইব। আপনার ঘরে তো বীজ আছে। বীজগুলি তো ঘরেই থাহে। এই বীজগুলি রাইখা দেন, না পুঁতেন ক্ষেতের মধ্যে?

দিমু, আপনারে আমি বীজ দিমু মাষ্টারমশায়।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- ক্ষেতের মধ্যে পুঁতি।

শিশু ঠাকুর ঃ- পুঁতলেই তো গাছ হইব। এই বুদ্ধিটাতো আপনার আছে। এই বুদ্ধিটাতো হ্যাই (সেই) দিয়া দিছে আপনারে।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ, হ্যাই তো দিয়া দিছে।

শিশু ঠাকুর ঃ- হ্যাই তো বুদ্ধি দিছে, বীজ পুঁতলে গাছ হইব। ফল পাকলে তার মধ্যেই বীজ থাকবো।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হ, তাতো ঠিকঐ, তাতো ঠিকঐ। তাইলে আমাগো বীজডা?

শিশু ঠাকুর ঃ- বীজ তো আছে আমার কাছে। বীজ তো বস্তার মধ্যে রাখছি।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- দিয়া দাও, দিয়া দাও, দিয়া দাও।

শিশু ঠাকুর ঃ- দিমু, আপনারে আমি বীজ দিমু মাষ্টারমশায়।

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- দাও। তুমি আমারে বীজ দাও। তুমি আমারে পথ দেখাও। আমার পরপারের কান্ডারী হও। আমারে পার কইরা দাও।

শিশু ঠাকুর ঃ- আসেন মাষ্টারমশায়। কানে মন্ত্র দিলাম। বীজ পুঁইতা দিলাম। (৭ বছর বয়স)

গুরুচরণ পন্ডিত ঃ- হা রে। তুমি কেম্‌নে বুঝছো? হা রে। আহ তুমি আমার কুলে (কোলে) আহ। তোমারে এট্টু কুলে লই। সোনা, সোনারে। কুলে লইয়া চলছে। তুমি নারায়ণ। তুমি গোপাল, তুমি গোপাল।

আসেন মাষ্টারমশায়। কানে মন্ত্র দিলাম। বীজ পুঁইতা দিলাম। (৭ বছর বয়স)

(শ্রীশ্রীঠাকুর শিশু বয়সের স্মৃতি চারণ করতে করতে বললেন, বাচ্চা বয়সের কিছু কিছু কথা তোমাদের শোনালাম। ঐ বয়সেই বীজ পুঁতে দেবার জন্য আর পথ দেখাবার জন্য কত লোক যে আসতে আরম্ভ করেছে। আর কি পথ যে দেখাতে আরম্ভ করেছি। বাপ্‌রে, বাপ্‌রে, বাপ্‌রে। বুঝছো?)

গুরু বিনা গতি নাই

পান্ডুলিপি হইতে সংকলন

(১৯৬৫)

জীবের লক্ষ্য এগিয়ে চলা। চলার পথে চলতে গিয়ে অনেক বাধা বিঘ্ন নানা সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে জীবকে পড়তেই হয়। সে চলার পথ সঠিক ভাবে দেখিয়ে দেবার জন্যই গুরু। অর্থাৎ গুরু হচ্ছেন গতিদাতা, গুরু হচ্ছেন বিরাটের প্রতিনিধি স্বরূপ, যাঁকে জানলে সব কিছু জানা যায়। তিনি যে বিরাটের প্রতিনিধি, সেই বিরাটকে জানার পথে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর কাজ। শিষ্যের চেয়ে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশী।

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ হচ্ছে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। সেখানে দেনা পাওনার কোন কথা নেই। পথ চলতে গিয়ে বাধা-বিঘ্ন ও নানা সমস্যা আসবেই। কিন্তু গুরুর উপর নির্ভর করলে গুরুই সব সমস্যার সমাধান করে দেন। তাঁর আদেশ নির্দেশ পালন করলে শক্তির স্ফূরণ হবেই। শুধু গুরুর তত্ত্ব ধারা অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে। তাঁর চিন্তা ধারার সাথে সাথে নিজেকে তৈরী করতে পারলেই সিদ্ধি-মুক্তি নির্বাণের জন্য মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় গিয়ে আর মাথা ঠুকতে হবে না।

গুরু হচ্ছেন গতিদাতা, গুরু হচ্ছেন মুক্তিদাতা, গুরু হচ্ছেন পথ প্রদর্শক। এক কথায় গুরু হচ্ছেন বিশ্বস্রষ্টার সাথে যোগাযোগের সেতু। গুরু-শক্তির প্রভাবে সিদ্ধি মুক্তি অনিবার্য। জন্মগত মহানই শুধু পারেন পথ দেখাতে, জীবের পরবর্তী অবস্থার গুরুভার একমাত্র সেই গুরুই বহন করতে পারেন, যিনি গতিদাতা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মের

জন্মগত মহানই শুধু পারেন পথ দেখাতে। জীবের পরবর্তী অবস্থার গুরুভার একমাত্র সেই গুরুই বহন করতে পারেন, যিনি গতিদাতা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন, জন্মের সাথে সাথেই গতির পথ দেখাতে শুরু করছেন।

সাথে সাথেই গতির পথ দেখাতে শুরু করেছেন। প্রকৃতির সুরে যেমন কোন ভেজাল নেই, গুরু বা মহানের সুরেও তেমনি থাকবে না কোন ভাব উচ্ছ্বাস, কল্পনা বা কোন অযৌক্তিক কথা। প্রকৃত গুরু বা মহানের কার্যকলাপ, গতিবিধি, চালচলন, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী সবই হবে বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত। তাঁর মুখে কল্পনা বা ধারণার কথা কখনই থাকবে না। ভড়ং দেখিয়ে জনগনকে তিনি কখনও বিভ্রান্ত করবেন না। তাঁর (গুরুর) কথায় যদি দ্বন্দ্ব ঘোচে বুঝতে হবে তিনিই প্রকৃত মহান। তিনি প্রকৃত গুরু হবার যোগ্য। দীক্ষা দেবার অধিকার কেবল তাঁরই আছে। তাঁর কথাতেই তাঁকে বাজিয়ে নিতে হবে। যাঁর হাতে জীবনের সর্বস্ব সঁপে দেবে, তাঁকে তো বাজিয়ে নিতেই হবে। দেখতে হবে তিনি সেই ভার ঠিক ঠিক বইতে পারবেন কিনা। তাঁর জ্ঞানালোকে মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে মানুষকে সঠিক পথে চালিত করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারেন কিনা। সত্যিকারের যিনি গুরু হবার যোগ্য তিনি কখনও বলবেন না, 'অষ্টমীতে ধ্যান কর, নবমীতে স্নান কর আর দশমীতে দান কর, তবেই ভাল ফল পাবে।'

আসল বস্তু সম্বন্ধে কখনও কারুর মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ আসেনা। দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ আসলে তখনই বুঝতে হবে সেখানে ভেজাল। তেমনি প্রকৃত সাধক, গুরু মহান, অবতার চিনতে কোন অসুবিধা হয় না, যদি তাঁদেরকে বাজিয়ে নেওয়া যায়। তবে সাধক, মহান, অবতার বলতে এখানকার বেশীরভাগ লোকেরা ভাবনে তাঁদের সঙ্গে উর্দ্ধলোকের বা স্বর্গের যোগাযোগ আছে। এঁদের দেবদর্শন, সিদ্ধি মুক্তি, নির্বাণ হয়ে গেছে। জনগণের সিদ্ধি, মুক্তি নির্বাণ সম্বন্ধে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর ব্যক্তি তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছে। তাদের মুখে শাস্ত্র, মন্ত্র-তন্ত্রের সংস্কৃত বুলি শুনে শুনেই সাধারণ মানুষও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এখানে বেশীরভাগ লোকের ধারণা শাস্ত্রের বুলি যে যত বেশী আওড়াতে পারবে, ভগবানের দুয়ারের দিকে সে তত বেশী এগিয়ে গেছে। তার ফলে তথাকথিত মহানরা নানারকম

তাঁর (গুরু) কথায় যদি দ্বন্দ্ব ঘোচে বুঝতে হবে তিনিই প্রকৃত মহান। তিনি প্রকৃত গুরু হবার যোগ্য। দীক্ষা দেবার অধিকার কেবল তাঁরই আছে।

বোল বলতে শুরু করেছেন আর ঐ বোলগুলোই সমাজের বুকে যত গন্ডোগোল পাকাচ্ছে। অযথা কল্পনার জাল বুনে বা শাস্ত্রের মুখস্থ বুলি আওড়িয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না, লোক ঠকানো যায়। তাতে সমাজে ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছুই হয় না।

শাস্ত্রের সুন্দর বোল, সুন্দর নিয়ম, সুন্দর বিধি-ব্যবস্থাগুলো শুনতে খারাপ লাগে না। কিন্তু সেগুলো পালন করলে যে ভগবৎ প্রাপ্তি বা দর্শন ঘটবেই, কেউ তা প্রমাণ করে যেতে পারেন নি। মানচিত্র পাঠ করলেই দেশভ্রমণ যেমন হয়না, তেমনি ভগবৎ দর্শন, সিদ্ধি মুক্তি, নির্বাণ-নির্বিকল্প সম্বন্ধে বড় বড় কথা বললেই এটা প্রমাণিত হয় না যে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই পথের সব কিছু দেখে এসেছেন বা তাঁরা ভগবানের প্রেরিত দূত বা প্রতিনিধি।

শাস্ত্রের সুন্দর বোল, সুন্দর নিয়ম, সুন্দরবিধি ব্যবস্থাগুলো শুনতে খারাপ নাগে না। কিন্তু সেগুলো পালন করলে যে ভগবৎ প্রাপ্তি বা দর্শন ঘটবেই কেউ তা প্রমান করে যেতে পারেন নি।

জন্ম থেকেই যাঁরা মুক্ত হয়ে এখানে আসেন তাঁরাই প্রকৃত গুরু। তাঁদের সুর অফুরন্ত। সে সুর কখন থামে না। এখানে যত সাধু, গুরু মহানদের কথা শোনা যায়, তাদের বেশীর ভাগই এখানে এসে সাধনা করে সাধু মহান হয়েছেন। এঁদের অনেকেই বড় বড় সাধকের পর্যায়ে পড়েন। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ হবেন জন্মগত। সত্যের সুর নিয়েই তাঁরা জন্ম গ্রহণ করেন। সত্যের সন্ধানে তাঁদের সাধনা করতে হয় না। সত্যকে নিয়েই তাঁদের আবির্ভাব। শিশুবয়স থেকে তাঁদের জ্ঞানের স্ফূরণ হতে থাকে। চৈতন্যের ধারা সবার ভেতরেই রয়েছে। কিন্তু শিশু বয়স থেকেই যাঁর ভেতর এই চৈতন্য স্ফূরিত হয়ে ওঠে তিনিই প্রকৃত মহান।

ভক্ত শিষ্যদের কি করে বিরাটের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় অনন্ত মহাশক্তিকে কিভাবে আয়ত্ত করা যায়। জীবের সুপ্ত ক্ষমতা কিভাবে জাগানো যায়। জন্মগত মহানের সেটাই একমাত্র কাজ।

ভক্ত শিষ্যদের কি করে বিরাটের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, অনন্ত মহাশক্তিকে কিভাবে আয়ত্ত করা যায়, জীবের সুপ্ত ক্ষমতা কিভাবে

জাগানো যায়, জন্মগত মহানের সেটাই একমাত্র কাজ। যে যেখানে আছে, যে যে পথে চলেছে তাকে সেই পথ দিয়েই এদিক ওদিক করতে করতে অনেক অনেক ফাঁক পেরিয়ে তিনি সবাইকে মহাসাগরের ধারায় নিয়ে ফেলেন। কাউকে তিনি হতাশ করেন না। প্রত্যেকের পছন্দমত পথ দিয়ে তিনি সবাইকে নিজের পছন্দ মত পথে চলতে দিয়ে তিনি সবাইকে নিজের পচ্ছন্দমত পথে নিয়ে আসেন। তিনি কখনও বলবেন না। তুমি পাপি, তুমি অভিশপ্ত, 'তোমার মন চঞ্চল।' তিনি বলবেন, তুমি তোমার বিচার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে কাজ করে যাও। লাটাই আমার হাতে। সময় মত ঠিক টেনে নিয়ে মহাসাগরের ধারায় ফেলে দেব। তোমার ভিতরকার সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে। সব বাধা মুক্ত হয়ে যাবে।

বিভিন্ন স্তরের গুরু মন্ত্র হিসেবে একই শব্দ ব্যবহার করলেও কার মন্ত্রে কতটা কাজ হবে তা নির্ভর করবে গুরুর নিজের ক্ষমতার উপর। সব গুরুর ক্ষমতাও এক নয়। অধিকারও এক নয়। যাঁরা যে স্তরের তাঁদের দেওয়া মন্ত্রের মাত্রাও সেই রকম। জন্ম থেকেই যিনি পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আসেন তার এক মাত্রা। আর এখানে এসে সাধন ভজন করে যাঁরা গুরু মহান হয়ে মন্ত্র দেন তাঁদের অন্য মাত্রা।

বাঁশির সুরে সাপ যেমন ফণা বিস্তার করে নাচতে থাকে। মহাকাশে মহাসুরের সাথে গুরুর দেওয়া মন্ত্রের সুর মিলে গেলে জীবের ভেতরকার জ্ঞান সর্প বা কুলকুন্ডলিনীও ফণা বিস্তার করে মহাশূন্যে বিলায়িত হতে থাকে।

জন্মগত মহান হয়ে যিনি এসেছেন সত্যদ্রষ্ট্রারূপে, তিনি যখন দীক্ষা দেন, এখানকার প্রচলিত সাধারণ শব্দই তিনি মন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব জন্মগত মাত্রার জন্য সে মন্ত্রে কাজ বেশী হবেই। কারণ তিনি যে মাত্রা থেকে এসেছেন সেই উঁচু মাত্রা থেকেই তো তিনি দীক্ষা দেন। মন্ত্র হ'ল লোহার মত। জন্মগত মহান গুরুরূপে যখন যে মন্ত্র ব্যবহার করেন তখন সেই লোহার ভেতরে তাঁর জন্মগত

জীবনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মনে বা মুখে যত শব্দ ব্যবহার করেছ জপের সংখ্যা যখন তার চেয়ে বেশী হবে, মন্ত্র তখন ঘড়ির কাঁটার মত ঢং করে বেজে উঠবে।

ক্ষমতারূপ বারুদ একটু লাগিয়ে দেন। ঐ বারুদের জন্যই তাঁর দেওয়া মন্ত্রটা বুলেটের মত কাজ করে। গুরু শুধু জানাকেই জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেন। মন্ত্রের মাধ্যমে শিষ্যের সুপ্ত শক্তিটাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেন তাঁর নিজের শক্তি দিয়ে। অনন্ত সৃষ্টির যে বীজশক্তি রয়েছে, তা সবার মাঝেই সহজাত, গুরু প্রদত্ত মন্ত্র অহর্নিশ জপ করে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই তার স্ফূরণ হয়।

বাঁশির সুরে সাপ যেমন ফণা বিস্তার করে নাচতে থাকে, মহাকাশে মহাসুরের সাথে গুরুর দেওয়া মন্ত্রে সুর মিলে গেলে জীবের ভিতরকার জ্ঞানসর্প বা কুলকুন্ডলিনীও ফণা বিস্তার করে মহাশূন্যে বিলায়িত হতে থাকে। জীবের ভিতরকার শক্তি তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে। যে মাত্রায় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে জীবের ভিতরেও তখন সেই মাত্রা জেগে উঠবে। যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী, চন্দ, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও জীবজগৎ সেই উদ্দেশ্যের পথে নিয়ে নেবার জন্যই মন্ত্র; গুরু যা দান করেন কর্ণযোনিতে। সিদ্ধি, মুক্তি যা হবার এতেই হবে।

বীজ মন্ত্রের গুণ এমনিতে বুঝা যায় না। জপ করতে প্রথমে ভালও লাগে না। মন বসে না, স্বাদ পাওয়া যায় না। কেমন যেন 'আলুনি' লাগে। 'অ, আ, ক, খ' শিখতে বা 'সা রে গা মা' সাধতেই বা কার ভাল লাগে? কিন্তু সাধতে সাধতে সুর আয়ত্তে এসে গেলে সবই ভাল লাগে। আমাদের দেহে শিরা-উপশিরা গুলো ক্যামেরার লেন্সের (Lense-র) মত কাজ করে। বিভিন্ন Glands-এর (গ্ল্যান্ড্স্-এর) মাঝে লেন্সের (Lense-র) মতই সব পাওয়ার (Power) রয়েছে। যতই আপন মনে নিজে মাঝে তন্ময় হয়ে জপ করে যাবে, সাথে সাথে দেহের শিরা-উপশিরার ভিতরে যে রক্ত কণিকা প্রবাহিত হচ্ছে, সেগুলো ততই একমুখী হয়ে উঠবে।

জীবনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মনে বা মুখে যত শব্দ ব্যবহার করেছ, জপের সংখ্যা যখন তার চেয়ে বেশী হবে, মন্ত্র তখন ঘড়ির কাঁটার মত ঢং করে বেজে উঠবে। তখনই তোমার জ্ঞান সূর্য যে প্রজ্বলিত রয়েছে,

তার আভাস পাবে। মহাকাশের প্রণবের সুর তখন তোমার মন্ত্রের সুরের সাথে গাঁথা হয়ে একসুর হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতি পুরুষের মিলন, শিবশক্তির মিলন। প্রকৃতি পুরুষের পরম মিলনের যে সুর, আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারের মিলনের যে সুর সেই গভীর সুরে মগ্ন হয়ে, তন্ময় হয়ে, তখনই তুমি জানতে পারবে তোমার স্বরূপকে, তোমার সত্যিকারের সত্তাকে। যে মন্ত্রের সাধনাতে ডুবে ছিলে এতদিন, সে সাধনা তখন সফল হবে। সেই মন্ত্রই তখন জানিয়ে দেবে, যা জানলে সবকিছু জানা যায় ও বুঝা যায়। সেদিন তোমার দিগ্‌দর্শনের কাঁটায় সুর মিলবে। সেই পরমসুরের পরমানন্দের নেশায় যখন বিভোর হয়ে যাবে, তখনই আসবে 'সিদ্ধি' অর্থাৎ সফলতা। বিশ্বসত্তা ও তোমার সত্তা যে একই সত্তার সত্তা। সেই বুঝ তখন সত্যিকারের বুঝে আসবে। কুলকুন্ডলীনিরূপ ফণী তখন আপনিই ফণা বিস্তার করে মণির সন্ধানে সন্ধানে 'সহস্রার' ফেটে বের হবে, সেই মণির সন্ধান পাবার জন্যই সবার সব (সকল) সাধনা। বীজমন্ত্র জপই হচ্ছে সেই সাধনার মূল। তখন বুঝবে পরমবস্তু বীজমন্ত্র হচ্ছে পরমহংসের ডিম। এমনি ডিম দেখে বুঝা যায় না যে, তার ভিতরেই রাজহাঁস লুকিয়ে আছে। জপ করতে করতে উপযুক্ত 'তা' বা হিট (heat) পেলেই বীজরূপ ডিম পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হয়।

জন্মগত মহানকে গুরুরূপে তোমরা পেয়েছ, তোমাদের রুখনেওয়ালা কেউ নেই; রুখতে তোমাদের কেউই পারবে না। গুরু হচ্ছেন গতিদাতা, বিরাটের প্রতিনিধি স্বরূপ। গুরু প্রদত্ত যে মূলমন্ত্র তোমরা পেয়েছ, তাকেই বারবার স্মরণ কর। 'হে পথিক জাগো জাগো। পথিক জাগো। আর যে সময় নেই। ধীরে ধীরে জীবন-প্রদীপের তেল যে ফুরিয়ে আসছে।' গুরুগত প্রাণ হয়ে যা বলি শুনে যাও। গুরুর আদেশ নির্দেশ হাঁসি মুখে পালন কর। তোমাদের কানে যখন মন্ত্র দিয়েছি, বাপ-বেটা বেটির সম্পর্ক হয়ে গেছে। তাই কখন যদি মনে সন্দেহ জাগে, জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। ভুল বুঝো না, ভুল করো না। সাধারণ আশ্রমের গুরুর মত তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক নয়। আমি তোমাদেরই ঘরের একজন। তোমাদের

বিশ্বসত্তা ও তোমার সত্তা যে একই সত্তার সত্তা সেই বুঝ তখন সত্যিকারের বুঝে আসবে। কুলকুন্ডলীনিরূপ ফণী তখন আপনিই ফণা বিস্তার করে মণির সন্ধানে সন্ধানে 'সহস্রাব' ফেটে বের হবে।

কানে যে বীজ দিয়েছি তা যাতে ফুটে ওঠে সে দায়িত্ব আমার। তোমাদের যাতে সেই পরমস্থানে নিয়ে যেতে পারি, সত্যিকারের আলো যাতে তোমাদের পৌঁছে দিতে পারি সে দায় আমার।

বেদের শাশ্বত সুর হতে যে নাম দিয়েছি সব সময় সেই 'রাম নারায়ণ রাম' নাম করবে। মূলমন্ত্র জপ করবে এবং তাতেই ডুবে থাকবে। 'দর্শন' ও 'অনুভূতি' তোমাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। তোমাদের চলার পথ সহজ হবে, যদি ধ্বনির গতি বাড়িয়ে যাও, জপের মাত্রা বাড়িয়ে যাও। সর্বদা গুরুকে স্মরণ করবে। একমাত্র গুরুর উপর নির্ভর করে তোমরা সব জানতে ও বুঝতে পারবে। তোমাদের জানিয়ে দেবার জন্য বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞান ভান্ডার আমি উন্মুক্ত করে রেখেছি। তোমরা যে নিচ্ছ না এটাই আমার দুঃখ। শেষে যখন অনুতাপ হবে, তখন যে চোখের জলই সার হবে। সময় থাকতে তাই সাবধান হও। না চাইতেই তোমাদের সব কিছু দিয়ে এসেছি। আরও দেব। তোমরা নিজেদের সুন্দরভাবে তৈরী কর। গুরুর আদেশ নির্দেশ হাসি মুখে পালন কর। এটাই হবে তোমাদের গুরু দক্ষিণা। শুধু ঘুমাবার আগে বসে বসে একটু জপ করবে । জপ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমের মাঝে যখন জপের কাজ চলবে, তখনই স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ হবে।

হে পথিক জাগো, জাগো পথিক জাগো। আর যে সময় নেই। ধীরে ধীরে জীবন প্রদীপের তেল যে ফুরিয়ে আসছে।

তোমাদের এখন কাজ হচ্ছে সংসারের সব কর্তব্য কর্ম ঠিক রেখে নাম করা আর জপ করা। তোমাদের সুবিধা হচ্ছে, যে মন্ত্র তোমাদের কানে দিয়েছি, সর্ব অবস্থায় তোমরা এই জপ করতে পারবে। চলতে ফিরতে যখন খুশী, তখনই করবে।

একটা কথা মনে রাখবে, স্তর অনুযায়ী এখানে সাধক, মহান, অবতার সিদ্ধপুরুষ, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের এক একজনের মন্ত্রে একেকরকম কাজ হয় তোমরা যে মন্ত্র পেয়েছ, তাতে আর তোমাদের জন্ম মৃত্যুর ছকে পড়তে হবে না। সেখানে সবটাই ইচ্ছাধীন। কারণ তোমাদের একেবারেই

মহাসাগরের মহাস্রোতে মিশিয়ে দিয়েছি, খাল, বিল, নদী, নালা দিয়ে নয়। এক জীবনেই তোমাদের লক্ষ কোটি জীবনের পাপ-তাপ বলে যদি কিছু থাকে, সব মুক্ত হয়ে যাবে।

মন্ত্র বা জপ হচ্ছে একজাতীয় ভাষা, যে ভাষাকে আয়ত্ত করলে সব অধিকার করা যায়। অজানা পথ জানার জন্য যে ব্যাকুলাত, যে আগ্রহ, ভিতরকার ইচ্ছা, সেই শক্তির দ্বারাই আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ে যাহা আছে, সেই শব্দব্রহ্ম হতে সেই শব্দকে আশ্রয় করে আমরা অখন্ড বিশ্বের সৃষ্টির ভিতর মিলিয়ে যেতে পারি। এই শব্দব্রহ্মের এমনই তেজ, এমনই তার শক্তি, আমাদের ভিতরকার সুরের সত্তাকে বিশ্ব বিরাটের তেজস্কর পদার্থের সঙ্গে মিলনের জন্য নিয়ে যায়। একেই বলে প্রকৃতি পুরুষের মিলন। সেটাই হচ্ছে মায়া প্রেম বা আকর্ষণ। এই আকর্ষণে যার যার সম্পর্কে সব আবদ্ধ হয়ে আছে বলেই জীবজগতে একজনের প্রতি আর একজনের প্রেম, ভালবাসা, সেটা বিরাট আকর্ষণেরই ধারা। সেটা এক একত্বের সুর। এই শব্দব্রহ্মকে আশ্রয় করেই, শব্দের বিনিময়েই জগতে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই শব্দ যদি মন্ত্র হয়, আর জপের মাধ্যমে এই মন্ত্রকে আয়ত্ত করা যায় তবে সব জয় করা যায়। তাই আমরা শব্দব্রহ্মকে আয়ত্ত করেই বিরাটের পথে এগিয়ে যাব।

যে উদ্দেশ্যে বিশ্ব প্রকৃতি হতে জীবজগতের সৃষ্টি, সেই বিরাট উদ্দেশ্যের সাথে সবাই যাতে সহজে যুক্ত হতে পারে, তার জন্য যেমন করেই হোক ঘুমের মাঝে নাম ও জপ চালিয়ে ঘুমের ক্ষুধা মেটাতেই হবে। শ্বাস প্রশ্বাসের খোরাক হিসাবে জপের ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই ঘুমোবার আগে অবশ্যই জপ করতে হবে। জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ঘুমের মাঝে যখন জপ চলবে টিক টিক করে আপনমনে, আপনসুরে তখনই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে তোমাদের যোগাযোগ

সাধারণ আশ্রমের গুরুর মত তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক নয়। আমি তোমাদেরই ঘরের একজন। তোমাদের কানে যে বীজ দিয়েছি তা যাতে ফুটে ওঠে, সে দায়িত্ব আমার।

হবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই স্বপ্নে তখন কত কি দর্শন ও অনুভূতি হবে। আবার ঘুম থেকে জেগে উঠেও জপ চলতে থাকবে আপন মনে। মনের বন্ধ দরজা তখন খুলে যাবে। অসম্ভবও তখন সম্ভব হবে। সিদ্ধি, মুক্তি নির্বাণ-নির্বিকল্প সবই তখন সহজসাধ্য হয়ে যাবে। মনটা তখন এমন মাত্রায় চলে যাবে যে, মনে মনে চিন্তা করলেই যে কোন বিষয়বস্তু সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। তুমি তখন পরমানন্দে বিভোর হয়ে পূর্ণ গতিতে পূর্ণের মাঝে, গতির মাঝে লীন হয়ে গতিময় হয়ে যাবে, পূর্ণ হয়ে যাবে। নিজের মাঝে ডুবে গিয়ে, প্রকৃতি-পুরুষের চির সঙ্গমের মাঝে লীন হয়ে, তুমি তখন এমন এক মাত্রায় চলে যাবে যে, কোন কিছুই আর থাকবে না, আবার সব কিছুই থাকবে। এভাবে নিদ্রা সমাধির মাধ্যমে জাগ্রত সমাধিতে এসে উপস্থিত হলে, বিশ্বের সকল ক্ষমতাই তোমার আয়ত্তে এসে যাবে। জাগ্রত অবস্থাতেই তখন দর্শন হতে থাকবে। এই অবস্থার নামই মুক্তাবস্থা বা মুক্তি। এর জন্যই সবার সৃষ্টি।

গুরু হচ্ছেন মাঝি। টেনে নেবার জন্যই গুরু। তোমাদের টেনে নিয়ে যেতে ইঞ্জিন হয়ে এসেছি আমি। তোমাদের চিন্তাধারা যে কোন অবস্থাতেই থাক না কেন, আমার কাজ হচ্ছে কোন রকমে বগীতে উঠিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া, যেখানে রয়েছে চির আনন্দ, যেখানে জন্ম মৃত্যু ইচ্ছাধীন। আর আমার জন্মগত সুরের সফলতা সেখানেই।

শুধু ঘুমাবার আগে বসে বসে একটু জপ করবে। জপ করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমের মাঝে যখন জপের কাজ চলবে, তখনই স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ হবে।

তোমাদের যে 'নাম' ও 'বীজমন্ত্র' দেওয়া হয়েছে তাতেই ডুবে থাক। একমাত্র গুরুর উপর নির্ভর কর। তোমাদের ঠাকুর পাপ পুণ্যের পরোয়া করে না। তাই কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পূণ্য, এ নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোমরা ঘর সংসার ঠিক মত করবে। পিতা মাতার সেবা করবে। সংসারের যা যা করনীয় সব রক্ষা

গুরু হচ্ছেন মাঝি। টেনে নেবার জন্যই গুরু। তোমাদের টেনে নিয়ে যেতে ইঞ্জিন হয়ে এসেছি আমি।

করবে। আর আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে নাম জপ করবে। কিছুই তোমাদের ধরতে হবে না। আর কিছুই তোমাদের ছাড়তে হবে না। ফোঁটা তিলক কাটতে হবে না, যাগযজ্ঞ, শাস্ত্র পাঠও করতে হবে না। শুধু লক্ষ্য রাখবে মৃত্যুর সময় যেন 'নামের' কথাটা 'জপের' কথাটা মনে থাকে। মনে রাখবে গুরুগত প্রাণ হয়ে, গুরুর আদেশ নির্দেশ হাসিমুখে পালন করলে, জন্ম জন্ম সাধনা করে যে ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, গুরুর কৃপাতে এক মূহূর্ত্তে তা পাওয়া যায়।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ছাত্র যখন গুরু হলেন

পান্ডুলিপি হইতে সংকলন।।

জ্ঞান ও গুণের কাছে আত্মীয় অনাত্মীয় নেই -- বয়সের ছোট বড় ভেদাভেদ, সেখানে নিতান্তই অর্থহীন। তাই একদিন যাঁরা ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষক, আজ তাঁরা শ্রীশ্রী ঠাকুরের (শিশুঠাকুরের) কৃপাধন্য হয়ে চরণাশ্রিত। সেইসব শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা শিশুঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন --

গৃহশিক্ষক প্রকাশচন্দ্র বল ঃ-

ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যাবস্থায় গৃহশিক্ষক ছিলেন; স্কুলেরও শিক্ষক ছিলেন। ইনি পরম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মত জীবনযাপন করিতেন এবং তাঁর ছাত্রের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গে বলেন, ''ভগবান বীরেন্দ্র চন্দ্র আমার ছাত্র'' -- এই কথা স্মরণ হইবামাত্র আমার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। যে শিশু বয়সে সকলের অদ্ভুত চপলতা প্রকাশ পায়, সেই বয়সেই ওঁকে দেখিয়াছি ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতে। সেই অল্প বয়সে একাসীন হইয়া বিভোর হইবার শক্তি যে ভগবৎ প্রেরিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পাতঞ্জল দর্শনে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্ট শক্তির উল্লেখ আছে, তাহা ওঁর মধ্যে দেখিবার

পাতঞ্জল-দর্শনে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্টশক্তির উল্লেখ আছে, তাহা ওঁর মধ্যে দেখিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ওঁর বিভূতির কথা বলিতে গেলে আর শেষ করা যাইবে না। নদীর উপর দিয়া হাঁটা, নদীর এপার হইতে ঐপারে এক নিমিষে যাওয়া, কোথায় কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা এক জায়গায় বসিয়া বলিয়া দেওয়া, কে কখন মরিবে, তাহা বলিয়া দেওয়া ইত্যাদি আমি বারবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ওঁর বিভূতির কথা বলিতে গেলে আর শেষ করা যাইবে না। 'তিতাস নদীর উপর দিয়া হাঁটা,' 'নদীর এপার হইতে ঐপারে এক নিমিষে যাওয়া,' মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হইয়া যাওয়া, 'কোথায় কি ঘটনা ঘটিয়াছে,' তাহা এক জায়গায় বসিয়া বলিয়া দেওয়া, 'কে কখন মরিবে' তাহা বলিয়া দেওয়া ইত্যাদি বারবার আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে সে (শিশুঠাকুর) অপূর্ব তত্ত্বকথা শুনাইত। আমি বিস্মিত হইয়া যাইতাম, অতটুকু শিশুর কণ্ঠ হইতে অত গভীর সত্যের কথা কি করিয়া বাহির হয়। আমি বলিতে বাধ্য হইলাম, 'আমি হইয়াছি, তোমার পুঁথির শিক্ষক। তুমি হও আমার ইহকাল ও পরকালের পুঁথির শিক্ষক।'

ওঁর শক্তি ও জ্ঞানের গৌরব কোনদিনই ছিল না। ওঁ (শিশুঠাকুর) সদা অমায়িক, মাষ্টার মহাশয় বলিতে আজও অজ্ঞান। সমাজে যাহাকে যতখানি শ্রদ্ধা ভালবাসা দেওয়া দরকার, সবাইকে তাহা দিয়া চলিত। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির নিকট স্কুলের ছাত্র মাষ্টার ও গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

হে মহাত্যাগী, তুমিই শক্তি, তুমিই পুরুষ, তুমিই আদি, তুমিই অনন্ত। তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট, তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার। বীরু, তুমি আমাকে আর্শীবাদ দাও। হে, বিরাট, হে পরম ভাগবত, হে পরম পুরুষ, তুমি ভক্তের অর্ঘ্য নাও। তাকে কৃপা করো, ধন্য করো। জীবনের সায়াহ্ন সমাগত। পরপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি, বারেবারে। কে যেন ডাকছে, আয় আয় আয়।

আমি হইয়াছি, তোমার পুঁথির শিক্ষক। তুমি হও আমার ইহকাল ও পরকালের পুঁথির শিক্ষক।

তুমি করুণা করো। তোমার পুণ্য স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে তোমাকে ধ্যান করতে করতে যেন সজ্ঞানে যেতে পারি সেই আনন্দলোকে -- তোমার বাল্যের শিক্ষক, যৌবনের দীন সেবকের একমাত্র অন্তিম প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ দাস ঃ-

গৌরভক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরেরই শিক্ষক ছিলেন না, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন সাহা মহাশয়েরও শিক্ষক ছিলেন। তিনি অধুনা বাংলাদেশের বাঞ্ছারামপুরের বাসিন্দা। শ্রীশ্রীঠাকুরকে চৈতন্য মহাপ্রভু বলেই মনে করতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করে তিনি ধন্য হয়েছেন।

বহু জন্মের সাধনা না থাকলে বেদের মর্মার্থ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। তোমার ভিতর জন্ম থেকেই এই সুর বিদ্যমান। তুমি সেই সুর নিয়ে এসেছো। আমাদের সেই সুরে নিয়ে যাও। আমরা এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। তুমি আমাদের পরমপিতা। আমাদের উদ্ধার কর।

শিক্ষক বিধুভূষণ দাস ঃ-

কুমিল্লা জেলার (অধুনা বাংলাদেশে) উজানচর কৃষ্ণনগর কংসনারায়ণ হাইস্কুলে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলে ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস পড়াতেন। তিনি কৃষ্ণধন সাহা মহাশয়েরও শিক্ষক ছিলেন। তখনকার দিনে বিশিষ্ট শিক্ষক হিসাবে ত্রিপুরা জেলায় তাঁর খুব নাম ডাক ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে অতি অল্পবয়সে বেদের তত্ত্ব শুনে তিনি অভিভূত হয়ে যান। এই শিশু ছাত্রের কাছে করজোড়ে তিনি বলেছিলেন, ''বহু জন্মের সাধনা না থাকলে বেদের মর্মার্থ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। তোমার ভিতর জন্ম থেকেই এই সুর বিদ্যমান। তুমি সেই সুর নিয়ে এসেছো। আমাদের সেই সুরে নিয়ে যাও। আমরা এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। তুমি আমাদের পরমপিতা। আমাদের উদ্ধার কর।''

পাঠশালার গোবিন্দ পন্ডিত ঃ-

দেখতে দেখতে বীরু (শ্রীশ্রীঠাকুর) পাঁচ বছরে পড়েছে। ভদ্র গৃহস্থ বাড়ির ছেলে, পাঠশালায় যেতেই হবে। এদিকে তো পড়াশোনায় মন নেই একেবারে। দিনরাত শুধু টো টো কোম্পানী। তাই জোর করেই পাঠানো হল গোবিন্দ পন্ডিতের পাঠশালায়। সে বড় কঠিন ঠাঁই। পড়তেই হবে, না পড়লে সাজা। পাঠশালা পালানোরও উপায় নেই। গোবিন্দ পন্ডিত অমনি গর্জন করে ওঠেন, 'দেখতো, ছোঁড়াটা আসেনি কেন? বাড়িতে কিছু হলে

কিছু বলিসনি। তা না হলে চ্যাঙদোলা করে কান ধরে টেনে নিয়ে আসবি। আমার কাছে কামাই চলবে না বাবা।'

অমনি ছেলের দল ছুটতো অনুপস্থিত সহপাঠীর খোঁজে। এহেন গোবিন্দ পন্ডিতের পাঠশালায় যায় বীরু। বগলদাবায় বই খাতা। হাতে খাগের কলম, কালির দোয়াত। লিখতে হয়। না লিখলে রেহাই নেই।

লিখছে বীরু। 'ক' আর বেরচ্ছেনা হাত দিয়ে। কাগজ ফুঁটো হয়ে গেল। তবু লেখা আর হয় না। গোবিন্দ পন্ডিত হিংস্র বাঘের মতো হুঙ্কার দেন, 'বাঁদর কোথাকার। বোস ওইখানে নাড়ুগোপাল হয়ে।' বীরুও সঙ্গে সঙ্গে নাড়ুগোপাল হয়ে বসে যায়। বসে বসে আকাশ-পাতাল কতো কি ভাবে। ওইটুকু ছোট্ট মাথায় কত চিন্তা। চিন্তার স্রোত এক সময় স্থির হয়ে আসে। নিমীলিত ধ্যানস্থ নেত্র। মুখে দিব্য জ্যোতি।

দিনের পর দিন যায়। পড়া কিন্তু যেই তিমিরে, সেই তিমিরে। গোবিন্দ পন্ডিতের ওষুধে কোন কাজই হয় না। যেচে সাজা নিতেই যেন চায় বালক। গোবিন্দ পন্ডিত ওষুধ পাল্টালেন, বললেন -- 'যা চাঁড়া কপালে দিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাক।' তথাস্তু। বালকও সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দিকে মুখ করে কপালে চাঁড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গোবিন্দ পন্ডিতের এ অস্ত্রও হলো ব্যর্থ। তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, ''তুই একটা অকাল কুষ্মান্ড। তোর কিছু হবে না।'' বীরু হাসে। মনে মনে বলে, 'পন্ডিতমশাই, ঠিকই বলেছেন। ও পথ আমার নয়।'

আর একদিনের কথা। বীরু যথারীতি চাঁড়া কপালে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় গোবিন্দ পন্ডিত, 'বাবারে গেলুম, গেলুম' বলে চিৎকার করে উঠলো। বীরু মুখ ফিরে দেখলে পন্ডিতমশাই পেটে হাত দিয়ে কাতরাচ্ছেন। যন্ত্রণায় শরীর গেছে বেঁকে। মুখ চোখ নীল হয়ে উঠেছে।

বীর জানতো গোবিন্দ পন্ডিতের শূল ব্যথা আছে। এরকম মাঝে মাঝে হয়ও। কতো কবিরাজী বড়ি খেয়েছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। বীরু দৌড়ে গেল তার কাছে। বললো, 'কি হয়েছে পন্ডিত মশাই?' পন্ডিতমশাই কথা বলতে পারছেন না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পেটে হাত দিয়ে দেখালেন। 'খুব ব্যথা?' গোবিন্দ পন্ডিত মাথা নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ।'

-- আমি সারিয়ে দেব?

সেই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও গেবিন্দ পন্ডিত একটু হেসে ফেললেন। পরক্ষণেই রাগে যন্ত্রণায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো তাঁর সর্বাঙ্গ। ভাবলেন, ছোঁড়াটা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। শিথিল হাতখানা কি যেন খুঁজছে। বোধ হয়, শাসনের সেই অমোঘ অস্ত্র বেতখানাকে খুঁজছেন গোবিন্দ পন্ডিত। এখনি বেয়াদপ ছেলেটাকে দেবেন এমন শিক্ষা যে, জীবনে আর কখনো কারুর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে সাহস করবে না 'ও'।

কে এই ধন্বন্তরি? তবে কি তিনি স্বয়ং নারায়ণ? আমি কত বকাবকি করেছি, কত শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু বীরু সব কিছুই মাথা পেতে নিয়েছে। হায়, হায়! আমি আমার ছাত্রকে কাছে থেকেও চিনতে ভুল করেছি।

-- আমি সারিয়ে দেব পন্ডিত মশাই? শান্ত মধুর কণ্ঠে বরাভয়। এতো বিদ্রুপ নয়। ধন্বন্তরির অভয় আশ্বাস।

গোবিন্দ পন্ডিত শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছেন। বীরু ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পদ্মহস্ত পন্ডিত মশাইয়ের পেটের উপর বুলিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ পন্ডিত সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ছাত্রের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'কে এই ধন্বন্তরি? তবে কি তিনি স্বয়ং নারায়ণ? আমি কত বকাবকি করেছি, কত শাস্তি দিয়েছি। কিন্তু বীরু সব কিছুই মাথা পেতে নিয়েছে। হায়, হায়! আমি আমার ছাত্রকে কাছে থেকেও চিনতে ভুল করেছি। পরে তিনি তাঁর এই ছাত্রের (শিশুঠাকুরের) কাছে, তাঁর মতে স্বয়ং নারায়ণের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন।

সেই থেকে গোবিন্দ পন্ডিত আর কোনদিন শূলব্যথায় কষ্ট পাননি।

তারপর তিনি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। এই অলৌকিক কাহিনী তাঁর কাছে অনেকে শুনেছেন।

শিক্ষক সনাতন সাহা ঃ-

তিনিও ছিলেন উজানচর কৃষ্ণনগর কংসনারায়ণ হাইস্কুলের শিক্ষক। খুবই বিদ্বান ও বিচক্ষণ ছিলেন। কৃষ্ণধন বাবুরও শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্কুলে ইংরাজী ও বাংলা পড়াতেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি তাঁর ছাত্রের (শিশুঠাকুরের) চরণ ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেছিলেন, ''একদিন আমরা ছিলাম তোমার শিক্ষাগুরু। ইংরাজী, বাংলা শিখিয়েছি। এখন তুমি আমাদের পরপারের গুরু। আমরা অজ্ঞান, আমরা অন্ধ। তুমি হলে অন্ধের যষ্টি। সুতরাং তোমাকেই ধরেছি। তুমি আমাকে পার কর।''

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আদর করে বলেছিলেন, ''আমি তোমার বাবা, তুমি আমার সন্তান।''

শিক্ষক কৃষ্ণধন সাহা ঃ-

ইনি কুমিল্লা, উজানচর কৃষ্ণনগর কংসনারায়ণ হাইস্কুলের (বাংলাদেশ) প্রধান শিক্ষক। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন সাহা মহাশয় তাঁর ছাত্র শিশুঠাকুর সম্বন্ধে বলেন, আমি এই হাইস্কুলে অর্থাৎ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। সেখানে শিশুঠাকুরকে ছোটবেলায় পড়াইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম যাহা মানব চরিত্রে দুর্লভ। শিশুঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। অবশ্য বালক মাত্রই সরল হয়। কিন্তু ঠাকুরের সরলতার মধ্যে ছিল একটা অস্বাভাবিক মাধুর্য ও কর্মনীয় ভাব। বিলাসিতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। একখানি নিমা ও পাতলা একখানা চাদর গায়ে দিয়া তিনি স্কুলে যাইতেন। তাঁহাকে কখনও

আমার প্রাক্তন প্রিয়তম ছাত্র ''শিশু ঠাকুর'' আজ আমার ভবতরীর কান্ডারী। হে ঠাকুর, আমি একদিন তোমাকে ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক পড়াইয়াছিলাম। আজ তুমি আমায় পরমার্থ লাভের সন্ধান শিখাইয়া দাও।

জুতা পায়ে দিতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁহার মুখে সবসময় একটা মধুর হাসি ফুটিয়া থাকিত। অপূর্ব সেই হাসি। তাঁহাকে দেখা মাত্র গভীর আনন্দ অনুভব করিয়াছি। স্কুলের সকল ছাত্রের মধ্যে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিয়াছি। কৃষ্ণনগর কাছারীর সম্মুখস্থ নদীর ঘাটে বহুক্ষণ ধরিয়া একাগ্র চিত্তে তাঁহাকে ধ্যান করিতে দেখিয়াছি।

সেই সময় কাছারীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে সর্বদা একত্রে থাকিতেন, তাঁহারা অনেক বিভূতি দেখিয়াছেন। সেই সময় আমাদের অঞ্চলে অনেকেই ঠাকুরকে 'বীরু গোঁসাই' বলিয়া ডাকিত। আমি প্রথম ঘটনাটি শুনি আমাদের বন্ধু ডাক্তার নীহারবাবুর নিকট। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'কাল কাছারীতে এক আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে সিঁড়ি দিয়া বীরু ছাদের সিঁড়ি কোঠায় উঠিল এবং সেই সিঁড়ি কোঠার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কতক্ষণ পরে আমরা উপরে যাইয়া দেখিলাম, বীরু সেখানে নাই। আমরা বিস্মিত হইয়া দালান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলাম, বীরু নদীর ধারে বসিয়া আছে।

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব। আমার বিবাহের পরে এগার বৎসর পর্যন্ত আমি নিঃসন্তান ছিলাম। ইহাতে আমার আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। আমার মা শিশুঠাকুরকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়া বিষয়টি জানান। এই ঘটনার দুইমাস পর আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং আমার প্রথম সন্তান অঞ্জলি জন্মগ্রহণ করে।

আমার প্রাক্তন প্রিয়তম ছাত্র ''শিশুঠাকুর'' আজ আমার ভবতরীর কান্ডারী। ''হে ঠাকুর, আমি একদিন তোমাকে ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক পড়াইয়াছিলাম। আজ তুমি আমায় পরমার্থ লাভের সন্ধান শিখাইয়া দাও''।

থাকে যদি পুঁজি, মাঝি হবে রাজী

(২১-০৫-১৯৮৪)

তোমরা চোখ বুঁজে ধ্যান কর, আমি আদিবেদের ধ্বনি শোনাচ্ছি। তোমরা আপনমনে জপ কর। আপন সুরে মগ্ন হয়ে থাক সবাই।

এই আদিবেদের ধ্বনি, যেটা আদিবেদের সুর, সেখানে কোন দেবদেবতা, ভগবানের বিষয়ে তখন কেউ জানতো না। তারা জানতো শুধু মহাশূন্যে সবাই বিরাজ করছে; সব গ্রহ নক্ষত্র চলছে একটা বিরাট শক্তির চালনায় বা তার ইঙ্গিতে। সে যে কে, সেটা কেউ জানতো না। আজ থেকে প্রায় ২৫ হাজার বছর আগে তোমাদেরই পূর্বপুরুষ যারা ছিল, এখনকার মত পূজাপার্বণ, যাগযজ্ঞ, মঠ মন্দির, তীর্থ বিগ্রহের সম্পর্কে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এরকম দেবদেবতাদের পূজা পার্বণও তখন ছিল না। তাদের একমাত্র সাধনা ছিল জানার। কিভাবে জানা যায়? কিভাবে সেই বিরাটের পথে, বিরাটের সুরকে আয়ত্ত করা যায়, সেইভাবেই তারা সাধনা করতো। আপনমনে সেই সাধনায় মগ্ন থেকে তারা খুঁজে বের করতে চাইতো, কেন জন্ম হলো? কোথায় আমরা মৃত্যুর পর যাব? কিছুই তো জানি না। নিসচয়ই সেই জানার পথ আছে। নিশ্চয়ই এই সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য আছে, মহৎ উদ্দেশ্য আছে, যা আমরা নিজেরা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা, দেশবাসীরা আপনমনে সকল কাজ কর্তব্যের ভিতর দিয়ে খুঁজে বেড়াত, কে এই সৃষ্টির মালিক? কে এই সৃষ্টি করলো? এমন সুন্দর, এমন অপরূপ, কার চেতনায়, কার ইঙ্গিতে এই

শূন্য পথের পথিক মোরা, কোথায় আছে, কি আছে, কিছুই তো জানি না। যদি কেউ জেনে থাক, আমাদের জানাও। আমাদের বলে দাও, সত্যিই কি এর পিছনে কেউ আছে? সত্যিই কি মৃত্যুর পরে কিছু আছে? আমাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

সৃষ্টি? তাই আমরা খুঁজে বার করতে চাই, এর পিছনে কোন্ ব্যক্তি আছে? এর পিছনে কি আছে? আগে আমরা সাধনা করতে ইচ্ছুক নই, না জানা অবধি। তাই তখন তারা সুরের সাধনা করতো। সেই সুর বিশ্বের সুর, সেই সুর আদি সুর, সেই সুর সৃষ্টির সুর, সেই সুর মগ্ন থাকার সুর। তাই বেদজ্ঞরা, ঋষিরা নিজেরা বসে বসে সেই সুর ধ্বনি দিত আর সবাই চোখ বুঁজে মহাকাশে, মহাশূন্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে তারা চিন্তা করতো, শূন্য পথের পথিক মোরা, কোথায় আছে, কি আছে, কিছুই তো জানি না। চলছি অনন্ত যাত্রার পথে। যদি কেউ জেনে থাক, যদি কেউ বুঝে থাক, যদি আমাদের অন্তরের কথা উপলব্ধি করে থাক, আমাদের জানাও, আমাদের দেখা দাও, আমাদের বলে দাও, সত্যিই কি এর পিছনে কেউ আছে? সত্যিই কি মৃত্যুর পরে কিছু আছে? আমাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

তাই সেই সময় সমস্ত দেশটা ছিল শান্তিময়। অভাব অভিযোগ ছিল না। খাওয়া পরার কোনদিক থেকে কোন অভাব ছিল না। প্রেম, ভালবাসা, অন্তরিকতায় ভরা এক একান্নভুক্ত পরিবারের মত গোটা দেশটা ছিল। অসুরদের প্রতিপত্তি, শোষকদের প্রতিপত্তি কারই ছিল না। হিংসা দ্বেষ ছিল না। তারা ছল চাতুরী মিথ্যাচার জানতো না। আর এখন? সেই দেশেরই সন্তান আমরা, তাঁদেরই রক্ত আমরা, আজ আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি। সবদিক থেকে যতরকম নোংরা, যতরকম নির্যাতন, যতরকম শোষণে ভরে গেছে দেশ। এই দেশ আবার কবে ঐদেশ হবে? সেটাই ভাববার। তোমাদের ভাবতে হবে। আমাদের ঐদেশে যেতে হবে। আমরা আমাদের সারবস্তুকে জানতে চাই। সবাই সেই বস্তুর অধিকারী হয়ে, সবাই একত্রিত হয়ে যেন কাজ করতে পারি। তারই প্রচেষ্টায় তারা সেই সাধনা করতো। আমরাও সেই সাধনা করবো। তারা যখন ধ্যানে বসতো, তাদের জপ ছিল না, তপ ছিল না, মন্ত্র ছিল না। তাদের মহামন্ত্র ছিল, মহাকাশের মহাসুরের সাথে সুর মিলিয়ে সেই সুরে পৌঁছানো। বেদজ্ঞরা সুরধ্বনি দিতেন বসে বসে। তাঁরা সুর দিতেন ভাল, সবসময়ে চর্চা করতেন। আমার মত সুর দিয়ে বিচার করা যায় না। তত্ত্ব জানা আছে। গলার স্বরটা ঠিক নাই। এত মীটিং করলে কি গলার স্বর ঠিক থাকে?

জন্মের সাথে সাথে মৃত্যুকে বরণ করেই নিয়ে এসেছি। তাই চলেছি মৃত্যুকে হাতে নিয়ে অনন্ত পথের যাত্রিক আমরা।

তোমরা চোখ বুঁজে যারা আছ, মনে মনে জপ করো। তাদের তখন জপ ছিল না। তোমাদের জপ দেওয়া হয়েছে। মনে মনে চিন্তা করো, তোমরা অনন্ত মহাকাশে শূন্যপথে ভ্রমণ করছো, চলছো। অনন্ত মহাকাশের যাত্রিক তোমরা। চলছো, দ্রুতগতিতে চলছো, এটাই মনে মনে ভাববে। আর জপের সাথে সঙ্গত করে চলবে।

সেই সময়ে তাঁরা কি করতেন? ধ্যানে বসে ধ্বনি দিতেন, আগেই বলেছি। তাঁরা বলতেন, হে জনগণ, হে দেশবাসী চলেছ সবাই একই সাথে। কোথায়? জন্মের সাথে সাথে মৃত্যুকে বরণ করেই নিয়ে এসেছি। তাই চলেছি, মৃত্যুকে হাতে নিয়ে অনন্ত পথের যাত্রিক হয়ে, পথিক হয়ে। আমরা এসেছি মাত্র, জন্ম নিয়েছি শুধু। কিন্তু 'হায়রে কপাল,' 'হায়রে অদৃষ্ট' বলে যা বলি, আমরা হারিয়ে ফেলেছি সব, মিথ্যাচারের ছলের চাতুরীর মাঝে আমরা হাবুডুবু খেয়ে চলেছি সদা। হিংসায় ভরা জীবন মোদের, আমরা চাই মুক্তি। আমরা চাই মুক্ত হতে। মুক্ত হতে হলে মুক্তির মন্ত্র গান করো।

জীবনের বাতি নিভে আসছে। কি কৈফিয়ত দেব, কি কৈফিয়ত দেব এই প্রকৃতির ধারাপাতায়? জীবনযাত্রার পথে আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি, ছলবল, কৌশল, মিথ্যা প্রবঞ্চনায়, প্রলোভনে ও যশের মাত্রা নিয়ে। হায়রে হায়, নিমিষে বাতি নিভে গেলে সব যায় নিভে।

এই জীবনে এই যে এলাম, কে যে থাকে, কে যে যায় -- কে যে আগে যাবে, কে যে পরে যাবে, কেউ কারও সাথে নেই। কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করছে না। মার খেলাম মায়ার বাঁধনের কাছে। মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়। নিমাই সন্ন্যাসে নিমাই মাকে বলছেন, স্ত্রীকে বলছেন, সবাইকে বলছেন,

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?
আমি যাই যাই মনে করি,
চলিতে না পারি,
মহামায়া আমার পিছনে ধায়।
মায়ার বাঁধন ছাড়া কিগো যায়?

মহাপ্রভু দেখলেন, জীবনের আর বাকী নেই। সময় তো আর নেই। সময় তো চলে যাচ্ছে। এই গৌরেরই রক্ত। তার মুখেই শুনতে পাচ্ছ, এই একই সুরের গান, একই ধ্বনি, একই নাদ। মহাপ্রভু বলছে, মা মাগো, বিষ্ণুপ্রিয়া শুনে রেখো, মনে রেখো, জীবনের বাতি নিভে আসছে। কি কৈফিয়ৎ দেব, কি কৈফিয়ত দেব এই প্রকৃতির ধারাপাতায়? জীবনযাত্রার পথে আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি ছলবল কৌশল, মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রলোভনে ও যশের মাত্রা নিয়ে। হায়রে হায়, নিমিষে বাতি নিভে গেলে সব যায় নিভে।

মা বলেন, শোনো আমি আর থাকতে পারছি না। নিমাই তখনি গানের সুর দিলেন।

এটাই হল, মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?
আমি যাই যাই মনে করি,
চলিতে না পারি,
মহামায়া আমার পিছনে ধায়।
মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?

তোমরা চলছো, চলে যাচ্ছ মহাকাশে। কোথায়? কোথায়? এইভাবে আর তো দিন কাটছে না। যদি কেউ থাকে, দেখা দাও, বলে দাও কি করতে হবে? আমাদের জানাও। নিভে আসছে, তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে বাতির। আমাদের শোনাও, সবাই বোঝ, সবাই জান কার পিছনে ধাইছ? যা ধরছো, তাতো থাকছে না। হে জগৎ, হে বিশ্ব কিছুই তো জানি না। চলছি তো চলার পথে। জানি জন্ম, জানি মৃত্যু -- এই সময়টুকুনুর মধ্যে আমাদের কি করতে হবে? শুধু খাওয়া খাওয়ি, মারামারি, দলাদলি, কাটাকাটি, সাম্প্রদায়িকতা, হিংসা দ্বেষ, এই কি আমাদের কাজ? সুতরাং বল, আমাদের জানাও। যদি থেকে থাকে কোথাও কিছু, আমাদের জানাও। আমরা অজ্ঞান জীব, অবোধ জীব। অন্ধকারে আছি। আমাদের বুঝিয়ে দাও, জানিয়ে দাও। এই ছলচাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনায় আমাদের ঘিরে ধরেছে। আমাদের সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা সর্বহারা হয়ে গেছি। আমাদের জানাও, আমাদের বুঝাও, আমাদের পথ বাতলিয়ে দাও। আমরা জপ, তপ, ধ্যান কিছুই তো জানি না।

এতবছর পরে পেলে তোমরা মহামন্ত্র। কানে দিয়ে দিলাম। সুতরাং গুরুগত প্রাণ হয়ে থাকবে। এই গুরু সেই মহাশক্তির মহা সুরকে আয়ত্ত করে এসেছেন। জন্মের থেকে যেই গুরুর সুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তিনিই একমাত্র পারেন দীক্ষা দিতে। ইহা ছাড়া দীক্ষা দেবার আধিকার কারও নেই। পরপর গদীর পর গদী, রাজার থেকে রাজা, গুরুর থেকে গুরু, এ কখনো হতে পারে না। এ এমন জিনিস, যার মণি আছে, তিনি যদি আবার মণি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই একমাত্র সবাইকে তুলে নিতে পারেন। ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যায় বহু বগ্‌গী, তেমনি ইঞ্জিনই পারে একমাত্র বগ্‌গীগুলোকে নিয়ে যেতে। তাই তিনিই ইঞ্জিন হবেন, যিনি জন্ম থেকেই ইঞ্জিনের শক্তি নিয়ে আসবেন। তিনি এখনকার জন্মে এখনকার কথা বলতে পারবেন। তিনি আগেকার জন্মের কথা বলতে পারবেন, তার আগের কথা বলতে পারবেন। তারও অনেক আগেকার কথা বলতে পারবেন। তিনিই একমাত্র জন্মগত সুর নিয়ে সুর বিতরণ করতে পারেন। তার সন্ধান দেন। তাই যে সুর তোমরা পেয়েছ, এই সুর পৌঁছিয়ে দেবে মহাসুরের কাছে, যাহা জানলে সব জানা যায়, সব বোঝা যায়। সেই সুর একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। তাই কি বলেছেন আদি বেদে? রাম নারায়ণ রাম। এই নাম মহাকাশের।

জন্মের থেকে যেই গুরুর সুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই একমাত্র পারেন দীক্ষা দিতে। ইহা ছাড়া দীক্ষা দেবার অধিকার কারও নেই। পরপর গদীর পর গদী, রাজার পর রাজা, গুরুর থেকে গুরু, এ কখনো হতে পারে না।

নীল আকাশের নীল বর্ণে কৃষ্ণাকাশ। কৃষ্ণ বর্ণে বর্ণিত করা হয়েছে। এখানে কৃষ্ণকে কৃষ্ণ নামে অভিহিত করেছেন গর্গ মুনি। ধ্যানেতে বসিয়া গর্গ রাখিলেন কৃষ্ণ নাম। এই মহাকাশের মহাকৃষ্ণ সেই বিরাট বিশালতার মাঝে তিনি বিরাজ করছেন। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, চন্দ্র-সূর্য-এটা হল সেই বিরাট বংশ। সেই বিরাট বংশের বাঁশী বাজালেন নীল আকাশের মহাকৃষ্ণ। বাজালেন সেই বংশের বাঁশী। এটি আমাদের দেশের বাঁশের বাঁশী নয়। সেই বাঁশী হল অনন্ত বংশের বাঁশী। সেই বাঁশীতে কার সাথে যোগাযোগ সূত্রে যুক্ত? এখানকার প্রেম করে রাধা নয়। সেই প্রেম হল ধারা, প্রেমের ধারা। অনন্ত ধারার সাথে যুক্ত হলেন কৃষ্ণ।

সেই কৃষ্ণের সাথে যুক্ত হয়ে তার ধারার থেকে ধরিত্রীর সৃষ্টি। সেই ধারা হ'ল, যোগাযোগ সূত্রে যুগল মূর্তির মূর্তি হিসাবে বর্ণনা করে ধ্যানধারণায় তাঁকে আনা হল। ধারাকে বারবার বললে রাধা হয়ে যায়। তাই রাধা হল ধারা। ধারা ধারা রাধা। ধারা বারবার বললে হয় রাধা। ধারা হয়ে যায় রাধা আর মহাকাশকে কৃষ্ণ বললে মহাকাশ হয়ে যায় কৃষ্ণ। তাই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির ধ্যান ধারণার মাঝে সেই বিশালতাকে নিজের ধারণায় যাতে সহজপথে আনা যায়, তার প্রচেষ্টায় ইহা করা হ'ল।

সেই ধারাবাহিকতার ধারাপাতায় রহিয়াছে রা, ম। 'রা' হচ্ছে মহাকাশ, 'রা'-র মধ্যে রয়েছে স্বরগ্রাম সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা। 'ম'-র মধ্যে রয়েছে মহাকাশের মহাশক্তির বিবরণ। 'নারা'-র মধ্যে রয়েছে আহ্বান। আয়ন করেছে অর্থাৎ আহ্বান করছে। সেই 'নারা' - অনন্ত ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে 'না' এর মধ্যে। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা, নি-না। সেই নি-না-র মধ্যে রয়েছে মহাকাশের 'নারা'। আয়নের মধ্যে রয়েছে আবাহন এবং তার যে মূলতত্ত্ব, মূল আকাশ; নারায়ণ হচ্ছে বিগ্রহ।

তার নাক নাই, চোখ নাই, মুখ নাই, একটি গোল বস্তু। সেই গোল বস্তু হচ্ছে মাথা। মাথা গোল আর আকাশকেও গোল দেখা যায়। আর প্রকৃতি বিকৃতি সবই গোল। তাই সেই গোলাকারের মধ্যে গোল বস্তুতেই রয়েছে মহাশক্তি, আধারস্বরূপ। সেই আধারকে নররূপে, সৃষ্টিরূপে, আয়নরূপে আহ্বান করলেন সেই নারায়ণকে। তাঁর বর্ণ? নীল আকাশের নীল বর্ণের সাথে যুক্ত করলেন। তাই মহাকাশের মহাশক্তি মহানামের অগণিত অবর্ণনীয় যাঁর বর্ণনা, অবর্ণনীয় যাঁর বর্ণ, সেই বর্ণবোধে কি আছে? এই ধারাপাতা রয়েছে, তার মধ্যে যে স্বরগ্রাম রয়েছে, যে সা-রে-গা-মা রয়েছে, যা ছিল মহাপ্রভূর আমলে, এখনও সেই নাম রয়েছে, ১৬টি নাম এবং ৩২ টি অক্ষর। তাই ১৬ নাম, ৩২ অক্ষরে ধ্বনিত হয়েছিল,

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই ১৬ নাম, ৩২ অক্ষরে রয়েছে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বহু নাম। যেমন - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই ১৬ নাম, ৩২ অক্ষরের মাধ্যমে সমস্ত

শিরা উপশিরায়, রক্ত কণিকায় বর্ণিত হল অগণিত বর্ণবোধ। দুবাহু উর্ধ্বমুখে তুলে দিয়ে গৌর কি করলেন?

হে হরে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ করে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। তাঁর নাম হল চৈতন্য। চেতনার খোঁজে তিনি চৈতন্যকে তাঁর সুরে বেঁধে রেখেছিলেন। আমরাও সেই মহা চৈতন্যের পথে তোমাদের যাত্রা শুরু করে দিয়েছি। তোমরা সেই চেতনার মন্ত্র নিয়ে, চৈতন্যভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ। কি নিয়ে? এই ১৬ নাম ৩২ অক্ষরেরই আরও দুধ মন্থন করে মাখন, মাখন থেকে মন্থন করে হ'ল ঘি। সেই তারই নামের আরেক নাম, অষ্ট নামে রাখা হল রাম নারায়ণ রাম। এই কয়টি নামে নামকরণ করে সেই সারেরই সার বস্তু স্বরূপ এই নাম, রাম নারায়ণ রাম। একই নামে একই বস্তু; যেমন জল আর বরফ - একই বস্তু নামে বিভক্ত মাত্র। তেমনি 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ১৬ নাম, আর 'রাম নারায়ণ রাম' এই ক'টি নাম। একই নামের মহানাম। তাই তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি মহাকাশের মহাবর্ণনার সুর, স্বরগ্রাম। তোমরা এই নাম সদাসর্বদা মুখে উচ্চারণ করবে। আর বীজ হল ধান। ধান দিয়েছি কানে। কানে ধান দিয়ে ধ্যানের কথা বলেছি। বীজ করবে ধ্যান। আর চাল হ'ল নাম। চাল ছাড়া তো চলে না। বাজারে কেউ বলে না, ধান চাই। বাজারে বলে চাউল চাই। চাউল হইল নাম আর চাউল যার থিকা হয়, তা হইল ধান। ধান আর চালের মধ্যে বিরোধ তো নাই। কিন্তু চাল পুঁতলে গাছ হয় না, ধান পুঁতলে গাছ হয়। তাই কানে দেওয়া হ'ল ধান, মুখে দিয়েছি চাল। চাল না চাইলে ধান পাবে না, আর ধান না চাইলে চাল পাবে না। তাই দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একই শক্তির একই ধারা, একই সূত্রপাত। তাই তোমরা কাজ করবে আর তোমাদের যা দিয়েছি, সেই নাম প্রচার করবে। ঘর রক্ষা করবে, পিতামাতাকে দেখবে, স্ত্রী পুত্রকে দেখবে এবং এই মহানাম ঘরে ঘরে প্রচার করবে। নানা বাধা আসবে পথে, অনেক বাধা আসবে। তোমরা এই মহানাম ভুলে যেও না।

আমরাও সেই মহা চৈতন্যের পথে তোমাদের যাত্রা শুরু করে দিয়েছি। তোমরা সেই চেতনার মন্ত্র নিয়ে, চৈতন্য ভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ। কি নিয়ে? এই ১৬ নাম ৩২ অক্ষরেরই আরেক নাম, অষ্ট নামে, রাখা হল, রাম নারায়ণ রাম।

থাকে যদি পুঁজি, তবে মাঝি হবেন রাজী। গুরু কি ধন, কররে যতন, অযতনে তারে রাখবে না, বুঝলে?

তাই থাকে যদি পুঁজি, মাঝি হবেন রাজী। গুরু রাজী হবেন তখন। পুঁজি তোমাদের সঞ্চয় নয়, সম্বল। সেই সম্বল নিয়ে চলরে সবাই। যেই সম্বল তোমাদের পাথেয় দিয়েছি; পাথেয় যা দিয়েছি এই পাথেয় নিয়েই তোমরা এগিয়ে চল।

পার করার তরী, এপার থেকে ওপারে নিয়ে যাবে যে তরী, উদারা নৌকা যাকে বলি, সেই নৌকা নিয়ে মাঝি বসে আছে। আসুন, আসুন, আসুন, সময় যে হয়ে গেল।

-- যাচ্ছি, মাঝি। তখন পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের করেছে।

-- না, না। এই পয়সা দিলে আমি নেব না।

-- পয়সা দিলে নেবে না? তাহলে পার করতে আসছো কিসের জন্য?

-- আমি পয়সার কাঙাল নই। আমি মাঝি, বড় পাজী, পয়সায় নই রাজী।

-- তবে কিসে তুমি রাজী?

-- আমি চাই সেই মহাস্বরগ্রামের ধ্বনি। যেই ধ্বনি উচ্চারণ করলে মহাকাশ থেকে সুর নেমে আসবে, মহাকাশ থেকে চৈতন্য নেমে আসবে। সেই সুরপাগলার সুর খুঁজে যার কাছে পাব, সেই সম্বল নিয়ে যে আসবে, তাকেই আমি পার করবো।

-- তাহলে সেই সুর, সেই সুর কোথা পাব, বল মাঝি?

-- কেন, তোমাদের গুরু দেননি?

-- দিয়েছেন, ঐ সুরে পার হ'য়ে যাওয়া যায়?

-- আরে বাবা, কি সুর দিয়েছেন?

-- দিয়েছেন গুরু। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

-- কি মাঝি এখন?

-- আস হে তোমরা, আমার তরীতে এখন। এই নাম উচ্চারণ করলে মধু ঝরে। মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম। বল, রাম নারায়ণ রাম। আস ভাই, তোমাদের তরী যে বসে আছে তোমাদের জন্য।

-- মাঝি ভাই, এরকম তরী যে আছে, তাতো জানতাম না। আমরা চিরকালই পয়সা দিয়ে পার হয়েছি। এরকম তরী যে থাকতে পারে, তাতো জানি না।

-- ওগো মাঝি ভাই, তুমি তো ভারী চমৎকার। তুমি এই নাম উচ্চারণ করলে পার করে দাও। তুমি কি খাও বলতো? তোমার জোটে কি করে?

তখন মাঝি ভাই বলছে, ভাসিয়ে দিয়েছি এই মহানামের তরী। যা জোটে, যদি কেউ দেয়, আশা আকাঙ্খা নেই। কিন্তু ভাই, এমনি জুটে যাচ্ছে। চাওয়া, পাওয়ার প্রয়োজন নেই। জল আছে, জল পান করি, আর এই মহানাম নিয়ে দিন কাটাই। যদি ভোগের কিছু জোটে তো হল, যদি না জোটে তো আমার দেহে যে মজ্জা মাংস আছে, তা দিয়েই আমার দেহ কিছুদিন চলতে পারবে। আমার দেহের মাংস তো প্রকৃতিরই দান, সঞ্চয়; না খেয়ে থাকলে আমার ক্ষুধায় যেটা খেতে থাকে দেহের থেকে। কিন্তু আমি ঐ ক্ষুধার ক্ষুধার মাঝে নিজেকে জড়িয়ে আর ক্ষুধার্ত্ত হতে চাই না। চরম ক্ষুধার পানে আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

-- না মাঝি, তুমি বলতো, তুমি কেন এত ভালবাস সবাইকে?

-- ভাই, যার মুখে নাম, তারই আমি দাস।

-- আচ্ছা মাঝি, শিখে নিলাম, তুমি আমাদের চোখ খুলে দিলে মাঝি।

-- আমি চোখ খুলে দিচ্ছি ভাই? চোখ খুলনেওয়ালা চোখ খুলে দিচ্ছে। তাই, ঐ একটি কথা, থাকে যদি পুঁজি, মাঝি হবেন রাজী।

-- আচ্ছা মাঝি ভাই, পার তো করে দিলে আবার ফিরে এলে?

-- এইভাবেই আবার নাম করবে। আবার পার করে দেব।

তাই তোমাদের মাঝি তোমরা নিজেরাই। বিবেক হল মাঝি। গুরু হচ্ছেন চৈতন্য। বিবেককে বলে দিয়েছেন চৈতন্য, তুমি সবসময় ওদের পাহাড়া দিয়ে রেখ। জানিয়ে দিও ওদের কোনটা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়। তাই বিবেক কিন্তু থাকে তোমাদের সাথে। তোমাদের সাথে হাত মিলিয়ে চলে না। তার সাথে না মিশে যদি থাক, তোমাদের কথা সে শুনবে না। সে সেকথাই শুনবে, যদি তার সাথে তার মতে চল। তবেই হবে বিবেকাধীন। তাই বিবেক বলছে, হে দেশবাসী, প্রত্যেকেরই তো বিবেক আছে। তোমরা এমন কোন কাজ করবে না, এমন কোন চিন্তা করবে না, এমনভাবে চলবে না, যাতে আমার বিবেকের বাইরে চল। আমার বিবেক মহাকাশের মহাদান, যা দিয়েছে তোমাদের দেহাভ্যন্তরে সেই বিবেক কিন্তু সর্বত্র সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে সাথে আছে। হে বন্ধুগণ, তোমরা, ফাঁকি দেবে সবাইকে। বিবেক কিন্তু ফাঁকি ধরে দিচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে, তোমরা বিবেকের বাইরে যেওনা, যেওনা। মহাকাশের কাছে এই কৈফিয়ৎ দিতে হবে, কি করেছ না করেছ জীবনের যাত্রার পথে। বিবেক বলছে, আমি তাঁর (চৈতনের) দাসানুদাস হয়ে কাজ করছি। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বুঝি তোমাদের চঞ্চল মন। তোমাদের অন্যায়, অপরাধ, তোমাদের নিম্ন কাজ, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, যতরকম অপরাধ করে যদি থাক, আমি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অবহিত। তাই তোমাদের ভাল করার জন্য মহৎ উদ্দেশ্যে, তোমাদের মহৎ স্থানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমার (বিবেকের) উপরে আদেশ নির্দেশ রহিয়াছে। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, তবে আর উপায় নাই, উপায় নাই। তাই মহামন্ত্র হচ্ছে বিবেকের মন্ত্র। মহামন্ত্র যে কানে দেওয়া হয়েছে, চৈতন্যের মন্ত্র। যে নাম দিয়েছি, বিবেকের নাম। এই নাম হচ্ছে মহা সুরের নাম, অনন্ত মহাধ্বনির নাম। এই নাম হচ্ছে অনন্ত বিশ্বের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে থাকার নাম। তাই তোমাদের একমাত্র সম্বল, চলার পথের একমাত্র পাথেয় এই নাম। কোনদিকে কেন চিন্তা না করে শুধু মুখে বল, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম।

যাক্ তোমাদের অল্প বিস্তর কিছু বললাম। তোমরা মনে রেখো।

এর প্রয়োজন আছে। মৃত্যু যখন আছে, জন্ম যখন নিয়েছ, বাবা তোমাদের পথের পাথেয় দিলেন। এই নিয়ে চল। আর কোন কিছুর দিকে তাকিও না। সংসার ধর্ম রক্ষা করো। মা বাবাকে দেখ, স্ত্রী পুত্রকে দেখ। আর বাবার দেওয়া এই নাম সম্বল করে পথিক চল পথ।

বাচ্চা বয়স থেকে আর কোন বিদ্যা আমার নাই, একটাই মহাবিদ্যা। সেই গভীর খনির কর্মী আমি। প্রকৃতির গভীর ভান্ডার থেকে বিরাট তত্ত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারবো। তাই বলি, মহাকাশের মহাখনির তত্ত্বের ভান্ডারের কর্মী আমি। এখানকার পুঁথির কোন বিদ্যা আমার নাই। এসব বুঝি না।

মাষ্টার মশাইয়ের কাছে বইয়ের কতগুলি পাতা ছিঁড়া দিয়া মাষ্টারমশাইরে বলছি, 'এইগুলি আপনারা পড়েন।'

মাষ্টারমশাই বলেন, এ তুমি কি করলে? বই এর পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেললে?

আমি বললাম, এতো ২৫/৩০ বছর ধরে ভূগোল, জ্যামিতি, ইতিহাস না কি, আকবর বাবর, এইগুলি আপনারা বইয়া বইয়া (বসে বসে) মুখস্থ করেন। এগুলি আমার দরকার নাই। সেই মাষ্টারমশাইরা সবাই আমার কাছে দীক্ষা নিছে।

তুমি যে বাবর, আকবর, হুমায়ুন ছিঁড়া দিয়া আইছো (এসেছো), তুমি তো অনন্ত ভান্ডার নিয়া বইসা (বসে) রইছো। অনন্ত ভান্ডার থিকা আমাগো কিছু দেও।

-- আপনারা আকবর চান না, বাবর চান না?

-- না, এইগুলি আমাগো দরকার নাই।

-- তবে কি চান মাষ্টারমশাই?

-- তুমি পরপারের কান্ডারী হইয়া আমাগো পার কইরা দেও।

-- দিমু মাষ্টারমশাই, আপনাগো আমি পার কইরা দিমু।

-- দেও, দেও।

-- আসেন মাষ্টারমশাই। এই বীজ দিয়া দিলাম। এইটাই আপনাগো পরকালের পুঁজি। আপনি যা চাইবেন, এতেই হইব।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-